স্বরূপ এবং স্নায়ু-সূত্রগুলি ঐ শক্তির বাহক-স্বরূপ। মোটামুটি-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিদ্যুৎপদার্থ উৎপন্ন হইয়া যেরূপ তার-যোগে অন্যত্র প্রবাহিত হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তর-প্রদেশে দুইটি বড় বড় স্নায়ু-পিণ্ড আছে যাহাকে ইংরাজিতে "গ্যাংলিয়ন" বলে—একটির নাম "অপ্‌টিক থ্যালামস" আর একটির নাম "কর্পস্‌ ষ্ট্রায়াটম্‌"। এই স্নায়ুপিণ্ডদ্বয় উপরিস্থ ধূসর প্রলেপের সহিত স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত। উহারা স্নায়ু-শক্তির উৎপাদন, পুঞ্জীকরণ, ও বণ্টনের প্রধান কেন্দ্র-স্থল।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন পাক-চক্র ও বিবিধ অংশের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে একস্থানে কোন উৎপাৎ উপস্থিত হইলেই তাহার ফল দূরবর্ত্তী অংশেও পৌঁছিয়া থাকে। মস্তিষ্ক যে দুই অর্দ্ধাংশে বিভক্ত—সেই দুই অর্দ্ধাংশ স্নায়ু-সূত্রগঠিত একটা চৌড়া পটির দ্বারা সংযুক্ত। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাতে আবার একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে—ইহারও প্রধান উপাদান স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র।

মস্তিষ্কের গঠন কিরূপ মোটামুটি তো একপ্রকার বলা হইল। এখন দেখা যাক্‌, মস্তিষ্কের ক্রিয়াসকল কিরূপে সম্পন্ন হয়। ফ্রেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ এক একটি বিশেষ মানসিক বৃত্তির আধার এবং কোন ব্যক্তির মাথার গঠন দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার বিশেষ প্রবৃত্তি কোন্‌ দিকে? তাঁহাদের মত কতদূর সত্য একথা এখানে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার মূলে যে কতকটা সত্য নিহিত আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। গল ও স্পুরৈজম্‌ এই সত্যটি আবি-

ষ্কার করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র কাজ আছে—এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষায় তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তবে, ফ্রেণলজিষ্ট-সম্প্রদায় মস্তিষ্কের যে যে অংশ যে যে প্রবৃত্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতের ঐক্য হয় না।

গল ফ্রেণলজির মত জারি করিবার অনেক দিন পরে ফ্লুরাঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কোন পশুর মস্তিষ্কের কোন অংশ সমগ্র মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সেই অংশের বিশেষ ক্রিয়া স্থগিদ হইয়া যায়। তাহার পর ষিফ্ আবিষ্কার করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অনুভব-ক্রিয়ার প্রভাবে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাপ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর ফ্রিস্ ও হিট্সিগ্ একটা কুকুরের মাথার খুলি অনাবৃত করিয়া তাহার মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে,মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ঐরূপে উত্তেজিত করিলে তাহার বিপরীত দিকের দেহ নড়িয়া উঠে। এই সময় হইতেই আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ফেরিয়ার হর্সলি যাফের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরও অনেক আবিষ্কার করেন।

তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কের একটা ম্যাপ প্রস্তত করিয়াছেন—দৃষ্টি-কেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, স্পর্শকেন্দ্র, ঘ্রাণকেন্দ্র,আস্বাদকেন্দ্র এবং পৈষিক গতি-কেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্রস্থান মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে আছে তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মস্তিষ্কমণ্ডলের উপরিভাগ ও পার্শ্বে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা আত্মসম্ভ্রম, দৃঢ়তা, উপচিকীর্ষা, অনুচিকীর্ষা, বিস্ময়, আশা ও সৌন্দর্য্যানুরাগের বৃত্তি নির্দ্দেশ করেন তত্রস্থ ধূসর পদার্থের কোন হানি ঘটাইলে তাহার বিপরীত দিকের সমস্ত শরীরের পেশী-

সমূহ অসাড় হইয়া পড়ে এবং ঐ অংশ উত্তেজিত করিলে বিপরীত দিকের দেহস্থ পেশীসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মস্তিষ্কের ঐসকল অংশ হস্ত পদ, বাহু, মস্তক, মুখ ওষ্ঠ প্রভৃতির গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্র-স্থান। বাম-দিকের কপালের রগ—যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা নির্ম্মিৎসার স্থান নির্দ্দেশ করেন তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বাক্যোচ্চারণ-ক্রিয়ার গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্রস্থান। এই কেন্দ্রটি যাহার ধ্বংশ হইয়া যায় সে অভাষা (Aphasia) রোগে আক্রান্ত হয়। অভাষা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সব কথাই বেশ বুঝিতে পারে অথচ কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। উহার নিকটস্থ আর একটি অংশ ধ্বংশ হইয়া গেলে লিখন-বিকার (Agraphia) উপস্থিত হয়—যে ব্যক্তি লিখনবিকারগ্রস্ত তাহার লেখা কেহ বুঝিতে পারে না। সে ব্যক্তির হস্তচালনা ক্রিয়া নিজের আয়ত্তে থাকে না। সুতরাং যাহা মনে করে তাহা কিছু লিখিতে না পারিয়া নানা-প্রকার হিজিবিজি আঁক পাড়িতে থাকে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা লোকাদর-স্পৃহা, বাস্তুনিষ্ঠা, সখ্য, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। কানের উপরিভাগে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা অর্জ্জনস্পৃহা ও জুজুগুপ্সার স্থান নির্দ্দেশ করেন উহা শ্রুতির কেন্দ্রস্থান। তাহার পর ঘ্রাণ, আস্বাদ এবং স্পর্শের কেন্দ্রসকল মস্তিষ্কের আরও নিম্নতর স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ফ্রেণলজি সম্বন্ধে কিছুই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না—কেন না তাঁহারা মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত করিবার সময় অন্য পার্শ্ববর্ত্তী অংশসকল দগ্ধ

করিয়া ফেলেন। মস্তিষ্কের সকল অংশের সঙ্গে যেরূপ যোগাযোগ আছে তাহাতে একাংশ নষ্ট হইলে অন্য অংশের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না হইতেও পারে—দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি সরলতর বৃত্তির ক্রিয়া হদ্দ প্রকাশ হইতে পারে—তদপেক্ষা জটিলতর বৃত্তি প্রকাশ না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কপালের মস্তিষ্কে যে বুদ্ধিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা একরূপ স্বীকার করেন—কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তো এবিষয়ে তাঁহারা কোন বিশেষ ফল পান নাই। ফেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলিতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন ইহা বিশ্বাস করেন। ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া এইমাত্র দেখিয়াছেন কপালের রগদেশ উত্তেজন করিলে মনোযোগক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রশস্ত কপাল বুদ্ধির নিদর্শন বটে, কিন্তু শুদ্ধ কপালের মস্তিষ্কই যে বুদ্ধির স্থান তাহা নহে—মস্তিষ্কের বোধবাহক ও গতিবাহক যতগুলি প্রধান কেন্দ্রস্থান আছে, সকলের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রভাবে বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে কপালের মস্তিষ্ক যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কতকটা অভাব-পক্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, যে সকল জীবের কপাল-প্রদেশের মস্তিষ্কখণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায় তাহাদের বুদ্ধি লোপ পায়। তাহারা অবাধে আহার করিতে পারে কিন্তু কোথায় তাহাদের খাদ্য তাহা জানিতে পারে না। যে কুকুরের এইরূপ কপালের মস্তিষ্ক বিনাশ পায় তাহার নিকট যদি একটা অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ কর তাহা হইলে সে অস্থি ধরিবার জন্য আগ্রহের সহিত দৌড়িয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে থামিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে না—হয়তো যেথানে অস্থিটি আছে তাহা ছাড়াইয়া কতদূর চলিয়া যাইবে।

ব্যাস্চিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফ্রেণলজিকে যে একেবারেই উড়াইয়া দেন তাহাও ঠিক্ নহে—আবার যাঁহারা বলেন ফ্রেণলজির দ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় তাঁহাদের কথাও ঠিক্ নহে। বেন এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যুক্তি-সিদ্ধ। তিনি বলেন—"মস্তকের গঠনের সহিত মানসিক বিশেষত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনেকটা লক্ষিত হয়—তবে, ফ্রেণলজিতন্ত্রে এই সকল বিশেষত্বের যতগুলি উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কতকগুলি টিঁকিয়া যাইতে পারে—আর কতকগুলি ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে।" শুধু মাথার খুলির গঠন দেখিয়া একজনের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যচরিত্রের বিশেষত্ব মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেক প্রতিভাশালী বিখ্যাত লোকের মস্তিষ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কের পাকচক্র সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক জটিল। সুতরাং, মাথা বড় কি ছোট ইহা শুধু দেখিলে চলিবে না—মস্তিষ্ক-পাকচক্রের অবস্থা কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক। ফ্রেণলজিতে তাহা দেখিবার উপায় নাই। তাই, ফ্রেণলজি কতকটা সত্য হইলেও অসম্পূর্ণ।

ফ্রেণলজির সহিত আধুনিক মস্তিকতত্ত্বের আর কোন বিষয়ে ঐক্য হউক বা না হউক, ফ্রেণলজি যে মূল-ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি ও শারীরিক ক্রিয়া প্রকাশের স্বতন্ত্র কেন্দ্রস্থল।

জাপানী সভ্যতা।

এপ্রিল মাসের ফর্টনাইট্‌লি রিবিউ পত্রিকায় জাপানী ব্যবহার সম্বন্ধে পিগট্‌ সাহেবের একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জাপানীদের যথার্থ আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্যবোধের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর এই অতি দূরপ্রান্তবর্ত্তী "অসভ্য" দেশের নিকট হইতে বলদৃপ্ত সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের শিখিবার এখনও কত কি আছে তাহাই দেখাইয়াছেন।

জাপানী আর্টের প্রশংসা এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বেও দু'একজন আর্ট-সমালোচক এমন কথা বলিয়াছেন—এবং য়ুরোপের উপরে ইহার প্রভাব যে সভ্যতাবর্দ্ধক ও উন্নতিকর এ কথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তাই বলিয়া সকল আর্টেই যে জাপান য়ুরোপকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য নয়। চিত্রবিদ্যার য়ুরোপে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে জাপানে ততদুর হয় নাই। জাপানী চিত্রকরের রচনায় ছায়া আলোকের সেরূপ পরিপাটি সন্নিবেশ দেখা যায় না। কিন্তু দুই চারিটি সূক্ষ্ম রেখাপাতে আর্টিষ্টিকতার যথেষ্ট পরিচয়। সুন্দর জিনিষকে সুন্দররূপে কেমন করিয়া ফুটাইতে হয় জাপানীরা তাহা বেশ বুঝে।

জাপানী আর্টের গৌরবই এই। কোথায় একটুখানি কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা দেখায় ভাল—একটি রেখা টানিলে অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়—একটু কারুকার্য্য করিলে চরম খোলতাই হয় জাপানীরা ঠিক ধরিতে পারে। জাপানী দোকানের একখান সামান্য পাখায়, একটা চারগণ্ডা পয়সার কাগজচাপায়, একটা যে-কোন-কিছুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানীদের মত দৈনন্দিন সামান্য ব্যবহার্য্য জিনিষেও সৌন্দর্য্য রক্ষা করার দিকে আমাদের কোন মনোযোগ নাই—কাজ চলিয়া গেলেই আমরা সন্তুষ্ট, মোটা তালপাতার পাখাই হোক্, গোলপাতার ছাতাই হোক্—দেখিতে ভালমন্দে আমাদের বড় যায় আসে না।

কিন্তু জাপানীরা সকল জিনিষকেই একটু সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের যত্নের ত্রুটি নাই। একটু কাঠকাঠরা তাহারা পড়িতে দেয় না—একটা না একটা সাজানগোছানর কাজে লাগাইয়া লয়। এবং এই সাজানগো ছানতেই জাপানীদের বিশেষ নৈপুণ্য।

ইংরাজ লেখক জাপানীদের এই গুণেই বিশেষ মুগ্ধ। তিনি সর্ব্বত্রই তাহাদের সুশোভন বিন্যাসপটুতার কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ফুলদানীতে কত রকমে ফুল সাজায়—এবং এই ফুল সাজাইবার জন্য কত রকমের ফুলদানী! সুরের বিচিত্র সমাবেশে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—ফুলের বিচিত্র সমাবেশে জাপানী বিন্যাসপটুতা তেমনি পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কণ্ডর সাহেবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ লাভ করা যায়। কিসের পর কি রঙ্ খাপ খায়, কোন্ ঋতুতে কিরূপ ফুলবিন্যাস শোভা পায়, কোন্ ফুল দেবতাকে দিতে হইবে, কোন্ ফুল বিবাহোৎসবের উপযোগী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। দুইটি তীব্র রঙের মধ্যে কোমল রঙের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। যে যে রঙে মিশ খায় না মধ্যে সবুজ পাতা কিম্বা শুভ্র ফুল দিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। ভিন্ন ঋতুর সঙ্গে ভিন্ন ফুলের যেন ভাবগত ঐক্য থাকে। বাসন্তী

ফুলবিন্যাসে নবীন যৌবনের শ্যামলতা, গ্রীষ্মকালে পরিপূর্ণ বিস্তারের ভাব, শরতে কার্শ্য এবং শীতে শুষ্ক নীরস জীর্ণতা।

ফুলদানী নানা রকমের—এবং নানারকম করিয়া ফুল সাজাইতে হয়। কণ্ডর সাহেব এক খাড়া বাঁশের নির্ম্মিত বিয়াল্লিশ রকম ফুলদানীর উল্লেখ করিয়াছেন—কোনটির নাম সিংহমুখ, কোনটি বা হংসদ্বার, কোনটি বানরদেহ, কোনটি বংশী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁশের গোড়া হইতে কাটিয়া নৌকাকারের নানা প্রকার ঝোলনা ফুলদানী প্রস্তুত হইয়া থাকে—তাহাতে এমন করিয়া ফুল সাজান হয় যে, দেখিয়া বোধ হয় যেন এক একখানি ফুলের নৌকা—ফুলের দাঁড়, ফুলের হাল, ফুলের মাস্তুল। নৌকা কোনটি বিদেশাভিমুখে চলিয়াছে, কোনটি বা বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ নানা ভাবের।

শেষ কথা, জাপানের সামাজিকতা—ভদ্রতার রীতিনীতি, মেলামেশার নিয়ম, কথাবার্ত্তার ধরণধারণ। সমাজকে সুসভ্য সুন্দর করিতে হইলে কতকগুলি শিষ্টাচারের নিয়ম বিশেষ আবশ্যক। ভাষা সুশোভন এবং ব্যবহার সুন্দররূপে সুসংযত হওয়া উচিত। কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজেই ইহার অভাব দেখা যায়। ইতর বর্ব্বরতা আমাদের দেশে যে কিরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত খবরের কাগজগুলি পড়িলেই বুঝা যায়—তাহা ছাড়া সম্ভাষণ অভিবাদনের ত কোন নিয়মই নাই। জাপানীদের ইহার বিপরীত। কথাবার্ত্তার মধ্যেও সৌন্দর্য্য যাহাতে রক্ষিত হয় সে দিকে তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যদি গলা থাকে গান গাহিতে বলিলে গান না গাহা, যদি বাজাইতে জানি ছ'শ ওজর আপত্তি করিয়া তবে সুর বাঁধিতে বসা এইরূপ অসামা-

জিকতা জাপানী চরিত্রে বিরল। জাপানীদের কোটো বলিয়া একপ্রকার যন্ত্র আছে—নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে কেহ তাহা বাজাইতে জানিলে গৃহকর্ত্তা প্রায়ই তাঁহাকে বাজাইতে অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে অভদ্রতা করা হয়। বিনাইয়া বিনাইয়া ভড়ং করা জাপানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। আরও এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের তাহাদের অনেক নিয়মাদি আছে—এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাপানের অবস্থার একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী যুবকদিগের অনেকেরই মধ্যে ইংরাজী ধরণধারণ প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের বড় বড় লোক সকলেরই বিশ্বাস যে, এ বিদেশীয়ানা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না—তবে জাপানী সভ্যতা ইহার দ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে।

আদিম সম্বল।

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোন কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয় যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে, স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসঙ্গত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর এক-জনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাই-াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তমনি সত্যপ্রিয়তা আর একটি। ছলনার প্রতি যে একটা া সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত লতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে র তেমনি স্বভাবসুস্থ যুবকজাতি সহজেই সত্যাচরণ করে। যদি বা কোন বয়স্ক বিজ্ঞ লোক এমন মনে করেন কথাটা সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও র স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে অতএব সেরূপ ধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত; কথাটা যেমনি প্রামা-হৌক্ তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে জাতির মাথায় ক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া

যাই হৌক্, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই ায় না। আমার কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে; জন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভাল । কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু

কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সেই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্য পক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্ম্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মত বানাইয়া তাহা হইতে নির্ব্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম, বিরোধ, সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করি লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনে সময় সত্যের জন্ম হয় কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বা হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আম সমাজের যে কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনি। অ অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চি হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলে সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজন তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক তাঁহারা খুব প

বলেন সন্দেহ নাই কিন্তু এত পাকা কথা কোন মানুষের মুখে শোভা পায় না। যে খাঁটি লোক, যাহার মন শাদা, যাহার পৌরুষ আছে সে বলে ফলাফল বিচার আমার হাতে নাই, আমি যাহা সত্য তাহা বলিব লোকে বুঝুক্ আর নাই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর নাই করুক্।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কি হিসাবে দেখিব? যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্টাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্ব্বে আমরা কখন এক জাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সঙ্কল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই সমস্ত সমবেত-হৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার ভ করিবে, এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসঙ্কোচে অসীম তার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদান প্রদান করিতে কবে; তাহার জ্ঞানের খণি তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহার মের পথ সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে,—তবে মনের মধ্যে শ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে স্বাধীতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহা[illegible] বুড়ামানুষের মত তর্ক করিয়া, [illegible] তুলিয়া

তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্ম্মে, সমাজে, দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম, ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা সহকারে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

দীপশিখা।

বৈশাখ মাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্ক মহাশয় জগদানন্দ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছে তাহার কোন কোন অংশ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে।

"অঙ্গারকণা সমুদয় যেমন এখানে (দীপশিখার বহির্ভা আসিয়া পড়ে, অমনি জলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়ি যায়, জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায় না। অঙ্গারকণার অংশ জ্যো[illegible] পুড়িয়া যায় তাহাই ধূম কারে [illegible]গ হইতে আলো হ

না এবং তাহা অপরিষ্কার থাকে।” দেউস্কর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

উপরের লিখিত কথাগুলি যদি সত্য হয়, [illegible]ব একথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অঙ্গারক বা[illegible]ম। [illegible] এরূপ কথা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না। যাহাকে ধূম বলি, সে জিনিষটার সঙ্গে আশৈশব পরিচয়। কতবার দেখিলাম, কতবার তাহা দ্বারা গাত্র পরিচ্ছদের মলিনতা সম্পাদন করিয়া গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলাম; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো ব্যতীত আর কোন জিনিষের লেশমাত্রও ত তাহাতে পাই নাই। “অঙ্গারক বায়ু” জিনিসটাকে লইয়াও বিস্তর নাড়াচাড়া করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ‘ধূম’ পাই নাই। না পাইবারই কথা, ঐরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষটাতে যে আবার ‘অঙ্গার’ আছে একথা পণ্ডিতেরাও ঝট্ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই শুনিয়াছি; সুতরাং অঙ্গারক বায়ুই যে দীপশিখার ধূমের কারণ একথাটা আমার মাথায় গলিতেছে না।

উত্তরদাতা মহাশয় লিখিতেছেন—“বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রভাবে অঙ্গারকণাগুলি জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া একেবারে পুড়িয়া গিয়া অঙ্গারকে বাষ্পে পরিণত করে। তাহাতেই ধূম উঠিতে থাকে।” দেউস্কর মহাশয় ধূমকে অঙ্গারক বায়ু মনে করিয়াছেন। আচ্ছা, যদি অঙ্গারক বায়ুই ধূম হয়, তবে যে শিখায় ধূম নাই, তাহাতে কি অঙ্গারক বায়ু হয় না? যদি না হয়, তবে কি হয়? আর যদি হয়, তবে তখন ধূম হয় না কেন?

অধিক বায়ু চিম্‌নির ভিতরে গেলে কি হয়, সে কথা এখন থাকুক, খোদ্ শিখার ভিতরে অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে কি হয় তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন। দোয়াতের আকৃতি-

বিশিষ্ট কেরোসিন তেলের আলোগুলির শিখাতে কি পরিমাণ ধূম হয়, যিনি না দেখিয়াছেন, এই বেলা একবার দেখুন। ইহার ভিতরে ব্লো-পাইপের সাহায্যে বায়ু প্রবেশ করান যাউক। সর্ব্বাগ্রে ধূমের [illegible] এবং শিখার উজ্জ্বলতা ইহার ফল। আরো অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে শিখার উজ্জ্বলতার হ্রাস হইবে, কিন্তু তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাইবে—কোন অবস্থাতেই ধূম কিন্তু একেবারেই হইবে না। ধূম যে নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো, ইহা অতি অল্প যত্নেই স্থির করা যাইতে পারে। প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় যাহা দীপের উজ্জ্বলতার কারণ হইয়াছিল, অপ্রজ্বলিত অবস্থায় তাহাই ধূম। অক্সিজেনের আধিক্যই যদি ইহার উৎপত্তির কারণ হয়, তবে এই সৃষ্টিছাড়া কথাটা মানিতে হয় যে অক্সিজেন অধিক হইলে জ্বলন্ত বস্তু নিভিয়া যায়!

শিখার অন্তর্ভাগে তৈল হইতে উৎপন্ন হাইড্রোকার্ব্বণ জাতীয় বাষ্পগুলি সঞ্চিত হইতেছে। অক্সিজেন এবং উত্তাপের সংশ্রবে এই বাষ্পগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন এবং কার্ব্বণ জন্মাইতেছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া জল হইল; সেই জল বাষ্পাকারে উড়িয়া গেল। কার্ব্বণ (অঙ্গার) কণার মধ্যে যেগুলি অক্সিজেন প্রাপ্ত হইল সেগুলি উক্ত অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারক বায়ু হইল। যেগুলি অক্সিজেন পাইল না তাহার কতক গরম হইয়া জ্বলিতে লাগিল, অবশিষ্ট অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেই শিখামুখে নির্গত হইল। যাহাতে জ্বলিল, তাহাকে আমরা শিখা নাম দিলাম, যাহা জ্বলিতে পাইল না (অপেক্ষাকৃত ভিতরে, সুতরাং উত্তাপ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল বলিয়া) তাহা ধূমের সৃষ্টি করিল। অক্সিজেনের

আরো অধিক হইলে, আরো অধিকসংখ্যক অঙ্গারকণা তাহার সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বায়ুর সৃষ্টি করিত। এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী অঙ্গারকণা উজ্জল হইয়া শিখার পুষ্টিসাধন করিত। চাই কি, এর পর আর ধূম হইবার যোগ্য অঙ্গার অবশিষ্ট নাও থাকিতে পারিত। প্রজ্বলিত কার্ব্বণকণাগুলি ঐ অবস্থায় অক্সিজেনের সংশ্রবে আসিলে অঙ্গারক বায়ু হয়—নচেৎ নিভিয়া গিয়া ধূমের দলে মিশে।

অক্সিজেনটাই বাস্তবিক খুব চাই; তার পর উজ্জলতাও যথেষ্ট চাই। একটী কার্ব্বণকণাও যেন অপ্রজ্বলিত অবস্থায় বাহিরে আসিতে না পায়; অর্থাৎ ধূম যেন না হয়। দাহনটী যেন নিঃশেষরূপে হয়।

অগ্নিকে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিলে উত্তাপ ঘনীভূত হয়, এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তাহার উত্তাপের অপচয় হয় না। কাচ লোহা ইত্যাদি গলাইবার সময় অগ্নিদেবকে কিরূপ সংকীর্ণ কারায় রুদ্ধ করা হয়, ভাবিয়া দেখুন। চিমনি-দ্বারা এই কার্য্যটা বেশ পরিপাটীরূপে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং চিমনি দিবার পূর্ব্বে এবং পরে ল্যাম্পের উত্তাপের কিরূপ তার-তম্য হয় তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে অনুভবও করা যায়।

খোলা ল্যাম্পের বাতাস পাইবার সুবিধাটা আপাততঃ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পরিমাণ ধরিলে বাস্তবিক বেশীই বটে। কিন্তু ঠাণ্ডা বলিয়া একে ত এই বায়ু শিখার তাপ হরণ করে, তাহাতে আবার শিখার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার নাই—অথচ সেটী চাই। শিখার উষ্ণ-পদার্থ বেগে উর্দ্ধগামী হইতেছে, যে বাতাস খুব বেগে আসিয়া তাহার গায় পড়িবে তাহা ছাড়া অন্ত বাতাসের এই

সহিত মিশিবার ক্ষমতা খুব কম। শিখার পদার্থ দগ্ধ হইয়া প্রবলবেগে চিমনির মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে। শূন্যতা নিবারণ করিবার জন্য বায়ু তদনুরূপ বেগে নিম্নদেশ দিয়া চিমনির ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে শিখার পদার্থের সহিত এই বাতাসের মিশিবার ক্ষমতা জন্মে; অথচ চিমনির ভিতরটা খুব গরম বলিয়া শিখার সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই তাহার ঠাণ্ডা দোষটা অনেক পরিমাণে দূর হয়। চিমনি ফাটা অথবা বায়ুর প্রবলতা উভয় কারণেই ঠাণ্ডা বাতাসের দ্বারা উত্তাপ নষ্ট হইয়া শিখার অনিষ্ট হয়।

উত্তাপ বেশী হইলে, আর উষ্ণ বায়ু শিখার পদার্থের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশিতে পাইলে শিখার আলো বাড়ে আর ধূম রহিত হয়। চিমনি দ্বারা এই দুইটী কার্য্যেরই সহায়তা করা হয়। বন্দোবস্তটী বেশ, কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে চিমনির আবিষ্কারের সময় এইরূপ উদ্দেশ্য উপায়ের আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই। চিমনির আবিষ্কর্ত্তা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পানের 'বিড়ের' আকৃতিবিশিষ্ট একটী কাগজের 'ঠোঙা' দিয়া একটী শিখাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বানরের ভাগ্যে কৌতূহলের ফল যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল সৌভাগ্যের বিষয়, সকল অবস্থাতেই সেরূপ হয় না।

এস্থলে একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েক বৎসর যাবৎ বাজারে সেণ্ট্রাল্ ড্রাফ্ট্ নামক এক নূতন কায়দার ল্যাম্প উঠিয়াছে। তাহাতে শিখার সহিত বাতাস বেশী পরিমাণে এবং ভালরূপে মিশিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ল্যাম্পের আলো পুরাতন প্রণালীর ...র আলোর অপেক্ষা পরিষ্কার।

স্বরবর্ণ 'অ'।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহারি অনুবৃত্তি-ক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

বাঙ্গলায় প্রধানতঃ 'ই' এবং 'উ' এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে গত শব্দের গ-য়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-য়ে ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণ এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখ।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্ত্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্ত্তী বর্ণে য-ফলা থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্ত্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলতঃ য-ফলা, ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্ব্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। *

---

* যফলা যেমন 'ই' এবং 'অ'র সংযোগ, বফলা তেমনি 'উ' এবং 'অ'র সংযোগ অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্ব্বনিয়ম খাটে। কিন্তু ব-ফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটা মনে পড়িতেছে, তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যথা অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, মন্বন্তরী। কজ্জ্বল, সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

ঋ-ফলাবিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃ, ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনা স্থলে আনা যায়। কিন্তু বাঙ্গলায় ঋ-ফলা উচ্চারণে ইকার যোগ করা হয় অতএব ইহাকেও পূর্ব্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না। †

অপভ্রংশে পরবর্ত্তী 'ই' অথবা 'উ' লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে। যেমন 'হইল' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ল', 'হউন' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ন' (কিন্তু 'হয়েন' শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হ'ন' উচ্চারণ হয়)। 'থলিয়া' শব্দের অপভ্রংশে 'থলে', 'টকুয়া' শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

'ক্ষ'র পূর্ব্বেও 'অ' 'ও' হইয়া যায়। যেমন কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ। 'ক্ষ' শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'ক্ষ'র সঙ্গে য-ফলা যোগ করেন ; এবং তাঁহাদের দেশের য-ফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন। যেমন, তাঁহারা 'লক্ষটাকাকে' বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা।'

যাহা হৌক্ মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই একটা ব্যতিক্রম আছে পূর্ব্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে 'ও' স্বরবর্ণের প্রতি বাঙ্গলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত আমরা সংস্কৃত 'অ'র বিশুদ্ধ

---

† মহারাষ্ট্রিয়েরা 'ঋ' উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের 'অ' সংস্কৃত 'অ' এবং 'ও'র মধ্যবর্ত্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে। যেমন 'অ' এবং 'উ'র মধ্য পথে 'ও'; 'অ' এবং 'ই'র সেতুস্বরূপ 'এ'; যখন এক পক্ষে 'ই' অথবা 'এ' এবং অপর পক্ষে 'আ' তখন 'অ্যা' তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন করে। বোধ হয় ভাল করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে বাঙ্গালীরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রশ্নোত্তর।

সন্ধ্যাকালে পশ্চিম গগন লোহিতাভ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নিবেদন করিতেছি।

ফাল্গুন মাসের সাধনায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটী যাঁহারা পড়েন নাই, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে সেটা পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি।

আলোকজনক ঈথরতরঙ্গগুলির যেমন কোনটী দ্রুত, কোনটী শ্লথ, তেমনি দ্রুতগুলির অপেক্ষা শ্লথগুলি আকারে বড়। মনে করুন লাল আলোর বড় বড় ঢেউগুলি যেন বড় বড় পাখীর ডানার ন্যায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নড়িতেছে; বেগুণী আলোর ছোট ছোট ঢেউগুলি মশা মাছির ডানার ন্যায় অতি দ্রুতভাবে কাঁপিতেছে।

লাঠি সোজাভাবে জলে প্রবেশ করাইলে অল্পেতেই তলা পাওয়া যায়; কিন্তু যতই 'তেরছা' ভাবে প্রবেশ করান যায়, তলা পাইতে ততই তাহার বেশীটা

জলে ঢুকাইতে হয়। আলোকের রশ্মিকেও তেমনি দুপুরবেলার অপেক্ষা বিকাল বেলায় অনেকখানি বেশী বায়ুর ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পৌঁছাইতে হয়।

জলের তরঙ্গের পথে নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল বাধাস্বরূপ থাকিলে দেখা যায় যে, ছোট ছোট তরঙ্গগুলি উহাদের আঘাতে লোপ পায়, কিন্তু বড় তরঙ্গগুলির তত ক্ষতি হয় না—উহারা ঐ সকল প্রস্তরকে অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে।

শব্দের তরঙ্গ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। সূর্য্যের শুভ্র আলোক যেমন নানাবর্ণের অনেকগুলি আলোকের সমষ্টি, তেমনি হারমোনিয়ম ইত্যাদি যন্ত্রের এক একটী 'রীডের' আওয়াজ তীব্র গম্ভীর বহুসংখ্যক আওয়াজের সমষ্টি। তীব্র আওয়াজগুলির আতিশয্যে 'রীডের' আওয়াজ অনেক সময় কর্কশ হয়। তখন কি করা হয়? না, জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন শব্দের তরঙ্গের পক্ষে তদনুরূপ কার্য্যকারী কোন পদার্থের প্রয়োগ করা হয়। রীডগুলিকে কম্বল অথবা তদনুরূপ কোন বস্ত্রদ্বারা ঢাকিলে, তাহার লোমে বাধা পাইয়া অতিশয় তীব্র ধ্বনির নিতান্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হীনবল হইয়া যায়। তাহার ফলে রীডের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয়।

আলোকের রাজ্যেও এই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন, শব্দের তরঙ্গের পক্ষে কম্বলের লোম যেমন, আলোক-তরঙ্গের পক্ষে বায়ুতে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি তেমন। সন্ধ্যাকালে এইরূপ কণামিশ্রিত অনেকখানি বায়ুর ভিতর দিয়া আলোককে আসিতে হয়। সবুজ, নীল, বেগুণী আলোর ছোট ছোট তরঙ্গগুলি ঐ সকল কণায় বাধা পাইয়া অল্পাধিক পরিমাণে লোপ পায়। বাকি থাকে লাল, লেবুর রঙ এবং হলদে রঙের আলো। ইহাদের মিশ্রণজাত আলোর যেমন রঙ তাৎকালীন আকাশের আমরা সেইরূপ রঙ দেখি।

ল্যাম্পের চিমনিতে কালী মাখাইলে তাহার ভিতর দিয়া আলোর শিখাকে অপেক্ষাকৃত লাল রঙের দেখা যায়। ইহারও কারণ ঐরূপ। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আলোকতরঙ্গগুলি কালীর কণার আঘাতে লুপ্ত হইয়া যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের মিশ্রণোৎপন্ন আলোর রং অপেক্ষাকৃত লাল হইবারই কথা।

কালীমাখান কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্ট করিলে দুপুরবেলায়ই সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত লাল দেখা যায়। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গতসংখ্যক সাধনায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়াছেন—তাহার দুই একটা বিষয়ে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকার উদয়কালে বৃহত্তর দেখাইবার কারণ যে দৃষ্টির ভ্রম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই—কিন্তু যখন সূর্য্য আকাশের নিম্নদেশে থাকে তখন বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থের সহিত ইহার আকার তুলনা করা যায় বলিয়াই যে ইহাকে বৃহত্তর দেখায়—এ কথা অবিসম্বাদে গ্রাহ্য করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে—যখন অসীম মহাসমুদ্রের মধ্য হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র উদিত হয় তখনও তাহাদের আকার বৃহত্তর দেখায় এবং যত আকাশের উপরে উঠে—ততই তাহাদের আকার কমিতে থাকে। যদি একখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থ দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া কাষ্ঠফলকের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যোদয় পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলেও ইহার গোলক বৃহত্তর দেখাইবে—তখন ত আর তুলনা করিবার কিছু রহিল না—তবে কেন সূর্য্যগোলক বৃহত্তর দেখায়?

আমার বোধ হয়, শূন্য হইতে পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশকালে সূর্য্যরশ্মিসকলের বক্র পথ অবলম্বনই (refraction) এই আকার বৃদ্ধির কারণ। সূর্য্যগোলকের প্রান্ত হইতে যে সকল রশ্মি আমাদের চক্ষে পৌঁছায়, তাহারা সূর্য্য হইতে এক সরল রেখা-ক্রমে আসে না বায়ু-স্তরের গাঢ়তানুসারে বাঁকিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে এবং রশ্মিসকল যে যে সরল পথ অবলম্বন করিয়া চক্ষে পড়ে, সেই সেই সরল পথের বর্দ্ধিতাংশে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই এটা আলোকের সাধারণ ধর্ম্ম। এই বিষয়টী লইয়া একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে—যে আকার বৃদ্ধির কারণ—রশ্মি সকলের পথ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি সমান ভূমিযুক্ত দুইটী বৃত্তসূচি (Circular cone) লইয়া তাহাদের সমান ভূমিকে উভয়ের সাধারণ ভূমি করিয়া সাজান যায়,—তাহা হইলে যে একটী চিত্র হয়—সূর্য্যরশ্মির পথও প্রায় সেই চিত্রের অনুরূপ; সূচিদ্বয়ের একটী শৃঙ্গ সূর্য্য ও অপরটী দর্শকের চক্ষু।

এখন যে সূচির শৃঙ্গ চক্ষু তাহার পৃষ্ঠ যদি সাধারণ ভূমির দিকে বর্দ্ধিত করা যায়—তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অপর সূচিটীর শৃঙ্গ প্রথম সূচির মধ্যে পড়িবে—অর্থাৎ আমরা সূর্য্যের আকার বৃহত্তর দেখিব।

যখন সূর্য্য আকাশের নিম্ন ভাগে থাকে তখন রশ্মিসকল গভীর জলীয় বাষ্প ও বায়ু স্তর ও তীর্য্যক ভাবে ভেদ করিয়া আসে বলিয়া রশ্মিসকল অধিক বাঁচিয়া যায়. কাজে কাজেই সূর্য্যের আকার ও বাড়িয়া পড়ে কিন্তু সূর্য্য যতই আকাশের উপরে উঠিতে থাকে—রশ্মিসকল লম্বভাবে বায়ুস্তর ভেদ করিতে আরম্ভ করে সুতরাং রশ্মি-পথের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না, এই কারণে তখন সূর্য্যের প্রকৃত আকার দেখা যায়। শ্রীহরিদাস চৌধুরী।

প্রশ্ন।

১। যদি পৃথিবীর উপরের কোন স্থান হইতে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটা যায় এবং এই সুড়ঙ্গের এক সীমা হইতে যদি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়—তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডটীর গতি কি প্রকার হইবে? এটী কি কেন্দ্রে গিয়া নিশ্চল থাকিবে?

২। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রে পশ্চিমদিকে কামান গর্জ্জনের ন্যায় যে শব্দ শুনা যায় তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রেও এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। শুষ্ক ভূমিতে অনেক দিন পরে বৃষ্টি হইলে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয় এ গন্ধটি কিসের? শ্রীহরিদাস চৌধুরী। কৃষ্ণগঞ্জ।

৪। কিয়ৎক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিলে আমাদের মাথাটী নিম্নদিকে তলিয়ে যায়, এবং আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভাসিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা আমাদের মাথাটী ভারী। এতখানি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র মাথা কিরূপে ভারী হইল তাহা পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব।

৫। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ বেশী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া নিবে কেন?

শ্রীসতীশচন্দ্র ওয়াদাদার। চট্টগ্রাম।

সাধনা।

হিং টিং ছট্।

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ!—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়
চখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা, এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝট্পট্,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁই-ফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে!
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কানোজ কাঞ্চি মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা!
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত!
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;

হিং টিং ছট্‌।

সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌!

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ!
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে বিচার!
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্‌পালট্‌!"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌!

স্বপ্ন কথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,

"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল!
হাঁফ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে!
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত,
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

200

উমেদার।

আমি উমেদার। তিন বৎসর ধরিয়া উমেদারি করিতেছি। চেষ্টার ক্রটি নাই, হাঁটাহাঁটির কসুর নাই, কিন্তু কিছু জুটে নাই। শুনা ছিল, রাজধানীতে কাজকর্ম্মের বড় সুবিধা, তাই কলিকাতায় আসিয়াছি। জানা ছিল, মাতুল মহাশয় কলিকাতায় একটা বড় রকমের কাজ করেন, দুই একটা ভেক্যান্‌সিও নাকি তাঁর হাত দিয়া যায়, তাই সেই আশায় ভর করিয়া মামার স্কন্ধে চাপিয়াছি। কিন্তু এ হেন মণিকাঞ্চনযোগেও আমার এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা হইল না। অনেক কাজকর্ম্ম খালি হইল, সইসুপারিশ তাও সাধ্যমত জুটাইলাম, দুই এক স্থলে আশাও পাইলাম, কিন্তু কেমন পোড়াকপাল, জুটে জুটে করিয়া আজ পর্য্যন্ত কিছু জুটিল না, আমি বেকার!

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি পিতৃ[illegible] উপার্জ্জন মন্দ করিতেন না, সৎব্যয়ে ও দানধ্যানে তাঁর [illegible] যশও বেশ ছিল, এখন ঐটুকুই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, [illegible] তাতে ত আর পেট ভরে না। পাঁচ দশ বিঘা জমাজমী [illegible] সামান্য অর্থ ও অলঙ্কার ছিল, দু ভগ্নী—দুটীর বিবাহেই ত[illegible] শেষ হয়। মার কষ্ট ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আঠার [illegible] বয়সেই আমাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইল, তার পর উ[illegible] সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি কিন্তু আজ এই তিন বৎসরেও [illegible] কূলকিনারা দেখিতেছি না।

বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে মা, বিধবা পিসি, [illegible] ভগ্নী ও একটী ভাই। ভগ্নী দুইটী বিবাহের পর হই[illegible]

সময় শ্বশুরালয়ে থাকেন, বাকী পরিবারবর্গের অভিভাবক এখন আমি, কিন্তু আমি বেকার!

মামা কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিতেন। বাবা মামাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, উপস্থিত কর্ম্মের সোপানও নাকি তাঁহা হইতে। ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াই হোক্, অথবা কৃতজ্ঞতার খাতিরেই হোক্ মামা পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পরিগ্রহ করার বছর দুই পর হইতে খরচপত্রের টানাটানিতে মামা আর কিছুই সাহায্য করিতে পারেন না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, মামার খরচপত্রের টানাটানি বুঝিয়াও আমাকে মামার বাসায় থাকিতে হইল। মামা কিছু আশা ভরসাও দিলেন, আমি সেই সাহসে, তাঁর সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও, তাঁর গলগ্রহ হইয়া বসিয়া বসিয়া তিন বৎসর কাটাইলাম— সাধে কি বলিয়াছি, গরজ বড় বালাই!

মামার প্রথম পক্ষের একটী পুত্র আর এক কন্যা; কন্যা শ্বশুরবাটী ভবানিপুরেই প্রায় থাকেন, কখন কদাচিৎ এ বাসায় আসেন, কিন্তু দুদিনের বেশী কখনও থাকিতে দেখি নাই। ছেলেটীর বয়স দশ এগার, নাম তার রাজন। দিদিমা রাজনকে বড় আদর দেন, পাছে সেই আদরে ছেলেটী নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে দিদিমাকে কলিকাতার বাসায় রাখা হয় না, তিনি বাটীতেই থাকেন।

কলিকাতার বাসার অন্যান্য পরিবারের মধ্যে নূতন মামী, আর তাঁর তিনটী সন্তান। মামীর মাসী, মামীকে "মানুষ" করিয়াছেন, তাঁর কাছছাড়া থাকিতে পারেন না, তাই তিনি মামীর

কাছেই থাকেন! আর মামীর একটী ভাই, সে রাজনের বয়সী, মামীর বড় ন্যাওটা, সুতরাং এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। মা এখানে, বাটীতে রাঁধিয়া দিবার লোক নাই, কাজেই মামীর মাস্‌তুত ভাই, মামীর চেয়ে বছর পাঁচের বড়, সেই মাস্‌তুত বড় ভাইটী এই পরিবার শ্রেণীভুক্ত, তিনি বিবাহিত ও সপুত্রক, অতএব তাঁর দারাসুতও অধিকাংশ সময় এইখানেই থাকেন।

মামী ছেলেগুলিকে একলা সাম্‌লাইতে পারেন না, সে জন্য চাকর চাকরাণীর সংখ্যা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইয়াছে, একজন পাচকও আছেন।

মামী তাঁর বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে। মাসকাবারে মামীর পিতা নিয়মিতরূপে মামীকে প্রতিমাসে দেখিতে আসেন; এই বৃহৎ সংসার ফেলিয়া, ঘরের গিন্নি মামী বড় একটা বাপের বাড়ী যাইতে পারেন না, কাজেই মামীর মাও মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিয়া যান।

মামীর সেই মাস্‌তুতো ভাইটী আমি আসার ৩৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছেন, কিন্তু চাকরীর উপর তাঁর বড় বিতৃষ্ণা, স্বাধীন জীবন বহন করিবার ইচ্ছা তাঁহার একান্তই বলবতী, তাই আর তিনি কাজকর্ম্মের চেষ্টা করেন না। চাকর চাকরাণীরা বড় চুরী করে, সেই জন্য বাসার বাজার করার ভার তাঁর উপর, তিনি কিছু বেশী খরচ করেন বটে, কিন্তু হলে কি হয়, চাকরেরা ত আর চুরী করিতে পারে না।

বড় ঝঞ্জাট বলিয়া টাকাকড়ি মামা নিজে হাতে কিছু রাখেন না; পূর্ব্বে মামার কিছু বাজে খরচ ছিল, অনর্থক দানে ও আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে মাসে মাসে তাঁর প্রায় ২০।২৫ টাকা অপব্যয় হইত, মামীর সুবন্দোবস্তে সে খরচটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

আমার আফিস নাই, সুতরাং সারাদিনই অবকাশ। আমি কলিকাতায় আসার দিন পনের পর একদিন মামীর মাসী কথায় কথায় আমায় বলিলেন, "দেখ সুরেন, একটা কথা আজ কদিন ধরে' এঁরা কেউ তোমায় বল্‌তে পাচ্ছেন না—জামাই, কামিনীকে (মামীর নাম কামিনী) রোজই তোমায় বল্‌তে বলেন, কিন্তু সে ত ভাই, ভেবেই খুন, কি করে' তোমায় বলবে, সে বলে, ও কথা আমি কেমন করে' সুরেনকে বলি, পাছে সে কিছু মনে করে; আরে বাছা সুরেন তো তোর ঘরের ছেলে, তাকে আবার লজ্জা কি? কেমন কিনা ভাই! আমি বল্লেম, তোমরা কেউ না পার আমিই বলব এখন, সুরেন তেমন ছেলেই নয়, শুনবামাত্র সে হাসিমুখে স্বীকার হবে।" আমি অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই ভূমিকা শুনিতেছিলাম, তিনি সমান বলিয়াই চলিলেন, "তোমার মামা বলেন কি রাজ-নের ত পড়াশুনা ভাল হচ্চে না, যে মাষ্টারটী আছেন সেও তেমন যত্ন করে' পড়ায় না, হাজার হোক সে ত পর বই নয়; তা তুমি যদি একটু মনোযোগ কর, তবেই তোমার ভাইটের কিছু হয়, রাজনের জন্যে তোমায় আর বেশী বল্‌তে হবে না, তার যাতে ভাল হয়, তুমি তাই কর, তোমার মামা ত তোমার উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্তি! আর গোপাল তোমার মামীর ভাই, সেওত কিছু তোমার পর নয়, তাকেও একটু একটু দেখো!" আমি বলিলাম আজ্ঞে তার আর কথা কি! তিনি অমনি মামীর দিকে নয়নপল্লব বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেখ্‌লি লো কামিনী, তুই আবার ভাব্‌ছিলি, পাছে সুরেন কিছু মনে করে, হ্যাঁলা, তুই কি সুরেনের তেমনি মামী যে ইত্যাদি।

পরদিন মামা আমায় বলিলেন, "হ্যাঁ হে তুমি নাকি বাড়ীর

মধ্যে ওদের কাছে বলেছ, মাষ্টার রাজনদের ভাল করে' পড়ায় না, তুমিই এখন হ'তে ওদের পড়াবে! সেত ভালই, তুমি ভার নিলে ছোঁড়াদের কিছু হতে পারে!"

পরদিন হইতে দশ টাকা বেতনের মাষ্টার মহাশয় বিদায় পাই-লেন। আমিই রাজনদের নিয়মমত পড়াইতে লাগিলাম। মামার এপক্ষের ছেলে ও মেয়েটী দুপুরবেলায় পণ্ডিতের কাছে পড়ে, আমি আসার পর মাস খানেক দেড় এই বন্দোবস্তে কাটিয়া গেল, একদিন শুনিলাম ছেলেরা খোট ধরিয়াছে, পণ্ডিত মশাই মারে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব! পণ্ডিত আসিয়া দুই দিন ফিরিয়া গেল ছেলেরা আর পড়িতে আসেনা, তাদের খোট সমানই চলিয়াছে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব। পণ্ডিত কিন্তু রোজই আসে, সাত টাকার মায়া সে বেচারী সহজে ত্যাগ করিতে চায় না—বুঝি পারেও না। মামী স্বয়ং একদিন আমায় ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু ভারি এক মুস্কিলে পড়েছি; তোমার ভাই বোন দুটী কি চোখেই যে তোমায় দেখেছে সুরেন দাদা সুরেন দাদা করেই তারা সারা! আবার কদিন থেকে খোট ধরেছে ওরা তোমার কাছে পড়বে, আর কারুর কাছে পড়তে চায় না, কি করি বল দেখি, পাছে তোমার কষ্ট হয় বলে' আমি ত তোমায় কদিন বলিইনি, তাড়াতুড়ি দিয়ে মেরে ধোরে কিছুতে ওদের যদি ভুলুতে পাল্লেম।" আমি কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছি, এমন সময় কোথা হইতে মামীর মাসী হরিনাম জপিতে জপিতে বলিয়া উঠিলেন "তা পড়াবে গো সুরেনই পড়াবে, ওকেত আর কোথায় বেরুতে হয় না, দুপুরবেলায় খেয়ে দেয়ে শুয়ে কাল কাটায় তা না-হয় ওদের নিয়ে দুদণ্ড বস্‌বে এ আর বেশী কি! কেমন সুরেন!"

এর পর হইতে ছোট ছোট ছেলেদেরও আমি পড়াইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ মামা কিছু সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিলেন, তখন আমি ছেলেদের পড়াচ্ছি; মামা বল্লেন কই আজ পণ্ডিত আসেনি, আমি যথাবিহিত উত্তর দিলাম। মামা বলিলেন, বটে তুমি ত হে দেখ্‌চি অনেক খরচ বাঁচাও, আচ্ছা আসছে মাস হ'তে এখন থেকে দিদির কাছে কিছু কিছু পাঠাব, দিদির ভারি কষ্ট হয়, না? আমার টানাটানি বলেইত এতদিন কিছু পাঠাতে পারিনি! মামার এই প্রস্তাবে কিছু আহ্লাদিত হইলাম, ভাবিলাম মায়ের কোনরূপে সাহায্য হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে পারি।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি একটা প্রয়োজনে উপরে গিয়াছিলাম, নীচে আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, মামীর মাসী পাশের ঘর হইতে যেন কাকে বলিতেছেন,"ভিজে বেড়ালকে চেনা ভার, বসে' বসে' পাতড়া মারবেন, আর মামার কান ভারি করবেন, ধন্য কলিকাল যাহোক! মামাতো ভাইদের পড়িয়ে টাকা নিতে লজ্জা করে না! পোড়াকপাল আর কি!" কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম, কেননা জানিতাম, "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" বেকারের মত সহিষ্ণু জন্তু বুঝি আর দুটী নাই! কবিরা বোধ হয় বেকারের মর্ম্ম জানেন না—নতুবা এহেন দ্বিপদ বেকার থাকিতে সহ্য গুণের উপমার জন্য চতুষ্পদের শরণ লইবেন কেন?

তার পর দিন দুই গেল, মামা আর কোন কথা আমায় বলেন না, যেন কিছু লজ্জিত লজ্জিত। একদিন, হঠাৎ আমায় ডাকিয়া বলিলেন "তাইতো হে সুরেন! দিদির ত দেখি ভারি কষ্ট, তার কাছে কিছু পাঠাবার বড়ই দরকার, তা এক কাজ কর

একটা প্রাইভেট টিউসনি দেখ, তাতে যে কটা টাকা পাবে, তাই দিদিকে পাঠালেই চলবে, তার পর যাহয় করব !" মামার বিপদ বুঝিয়া বড় দুঃখেই মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, প্রণয়স্রোতে মামার আমার আজ লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি পূর্ব্ব হইতেই একটী প্রাইভেট টিউসনির জোগাড় দেখিতেছিলাম, সেই দিন হইতে আরও একটু বেশী বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলাম, উমেদারের সহিত ছোট বড় অনেক লোকেরই আলাপ। কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত বোধ হয় এত লোকের আলাপ হয় না। সবেমাত্র "সেসন" খুলিতেছে কাজেই আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না, শীঘ্রই একটী টিউসনি জুটিল, বেতন বার টাকা। তখন হইতে বাড়ীতে মার নিকট মাসে মাসে দশ টাকা পাঠাইতে লাগিলাম, অনেকটা অভাব ঘুচিল। আমি কতক নিশ্চিন্ত হইলাম, মামাও বাঁচিলেন।

এই বাঙ্গলা দেশে আমাদের মত বেকারের অন্ন জুটিতে না পারে, কিন্তু পাত্রী জুটিতে বাকী রয় না, সব বন্ধ থাকে, কিন্তু বিবাহ বন্ধ থাকে না। আমার সম্বন্ধ জুটিল, বিবাহ ত হইল। সবে মাত্র কাজের চেষ্টায় আসিয়াছি, তখনও বুকভরা আশা, মনভরা উৎসাহ, তবু সে সময় আমি বিবাহের প্রস্তাবে প্রথমে অমত করিয়াছিলাম, কিন্তু মামার অনুরোধে মামীর বেগুণফুলের কন্যার সহিত বিবাহ করিতে হইল।

বিবাহের পর বার তিনেক শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম, শেষবার শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন "বাবাজি একটা কাজকর্ম্ম কর, এমন নিশ্চিন্ত থাকাটা ত আর উচিত হয় না।"

বড় ঠাকুরঝি বলিয়াছিলেন "শুন্‌ছি নাকি তুমি খুব ফেরাই

মেয়ে মেয়ে বেড়াচ্চ, পুরুষ মানুষ দু পয়সা উপার্জ্জন না কল্লে কি মানায়!" ইত্যাদি।

আমি বেকার বসিয়া আছি, সকলেই জানেন আমার অনেক সময়! আত্মীয় মুরুব্বিগণ সকলেই বলিতেন এ বয়সে বসে' থাকা কিছু নয়, যাতে তাঁতে ঢুকে পড়; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন, শেষে কেহ অনুগ্রহ করিয়া দুই চারিটা ফাইফরমাস আমার উপর চাপাইতেন, সে ফরমাস নানা রকমের, সে সব সামান্যই কাজ—না করিয়া দিলে চলে না, আপত্তি খাটে না! একদিন ট্রামে আসিতেছিলাম, ট্রান্সফার টিকিট ছিল, বৌবাজারের চৌমাথায় নামিলাম, দেখিলাম একটী ঘোড়া বড় নাকাল, তার কাজও নাই, কামাইও নাই। যতগুলি গাড়ী আসিতেছে, চৌমাথার ব্যাঁক পার হইবার সময় সেই ঘোড়াটীকে অতিরিক্তরূপে যুতা হইতেছে, সে বেচারী সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে, কিন্তু তার কাজ কোন কাজের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে, তার বিশ্রামের গৃহ নাই, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্রে পুড়িতেছে! তার অবস্থা দেখিয়া একবার নিজের অবস্থা মনে পড়িয়াছিল।

আমি প্রায়ই কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বড় বড় চাকরের, বড় বড় জমীদারের, বড় বড় মুরুব্বির বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই। বিশেষতঃ রবিবারে ত আমার সকাল বিকাল কামাই থাকে না। মাঝে মাঝে আফিস অঞ্চলেও যাই, আফিসে গিয়া আশা পাইয়া কোন কোন দিন বা বাবুদের বাটীতে যাই। বাড়ী গিয়া কোন বাবুর সাক্ষাতের আশায় ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করিয়া শুনিতে পাই, "বাবু আজ বড় ব্যস্ত, আর একদিন আস্‌তে বল্লেন।" কোথাও বা সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং বাবুর দর্শন লাভ ঘটে, কিন্তু

ফলটা প্রায়ই একরূপই দাঁড়ায়। কোন কোন বাটীতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না, দরোয়ানজীর অনুগ্রহে নগদ নগদ বিদায় পাই। আমি কিন্তু আশা ছাড়ি না, বাবুদের নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করি না, যদি কখন কেহ আমার এইরূপ যাতায়াতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি তখন মনে মনে নিধুবাবুর সেই গানটী ভাবি—

"আমি তোমারে দেখ্‌তে আসি দেখা দিতে আসি না।
আমার স্বভাব আমি তোমা বই জানি না।"

তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বাসায় যাই, তখন বেলা কিছু বেশী হইয়া পড়ে, বাসায় যাইয়া শুনি চাকর চাকরাণীরা আমার সম্বন্ধে নানারূপ মিষ্ট আন্দোলন করিতেছে। আহার করিতে গিয়া দেখি, ভাত বাড়া রহিয়াছে, চালের সহিত তার আর প্রভেদ করা যায় না, কোন দিন বা দেখিতে পাই, অন্নপাত্রের উপর কুকুর বিড়াল ও বায়সবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের বলবুদ্ধির পরীক্ষা করিতেছে।

মধ্যে মামার আফিসে একটী কাজ খালি হইয়াছিল, মামার কথায় বুঝিয়াছিলাম সে কর্ম্মে মামার বিশেষ হাত আছে। মামার এক জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা আছেন। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর বাসা। তিনি মামার নিকট প্রায়ই আসিতেন। লোকটি বড় ভাল, কিন্তু কিছু স্পষ্টবাদী, অন্যায়টা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তিনি আমায় কিছু স্নেহ করিতেন, আমার জন্য মাঝে মাঝে উপরপড়া হয়ে মামাকে বলিতেনও। এক্ষণে এই কাজটীর কথা শুনিয়া মহা আনন্দসহকারে মামাকে বল্লেন, "দেখো ভাই, এটা যেন আর সুরেনের ভাগ্যে ফস্কায় না।" মামা উত্তর করিলেন "না, এটা বল্‌তে গেলে একরকম আমার এক্তারেরই মধ্যে।"

দুই দিন যেতে না যেতে দেখি, মধ্যাহ্ণে ব্যাগহস্তে মামার এক সম্বন্ধী উপস্থিত—ইনি মামীর সহোদর এবং কনিষ্ঠ। জানি না কেন তাঁহাকে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধটা ঠিক করিতে পারিতেছি না—তাঁহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল! বুঝি নিশীথ রাত্রে কারাগৃহে নবাবপুত্রী আয়েষাকে নির্জ্জনে জগৎসিংহের নিকট দেখিয়া ওসমানের হৃদয় এমনই কাঁপিয়াছিল! সেই দিন মাতুল মহাশয় যখন আফিস হইতে ফিরিলেন, আমি তখন কার্য্যান্তরে উপরে ছিলাম; দেখিলাম মামা ঘরে যাইবামাত্র, পাখা হাতে মামী, তাড়াতাড়ি, মামার চাপকানের বোতাম খুলিয়া দিতেছেন, আমি অন্তরালে ছিলাম, হঠাৎ এ ঘটনাটী আমার চক্ষে পড়িল! মামার চক্ষের সেই সহাস্য দৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গের সেই আবেশময় সৃষ্টি আর মুখের সেই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বুঝি এ সুখসম্ভোগ মামার পক্ষে বড় সুলভ নহে!

পরদিন একটু সকাল সকাল মামা আফিস চলিয়া গেলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আফিস যাইবার কথা, মামা কিছু না বলায় ভবিলাম তাড়াতাড়িতে বুঝি বা ভুলে গেছেন; মামার আফিস চিনিতাম, আহারান্তে আফিস গেলাম। গিয়া দেখি, মামা তাঁর সেই সম্বন্ধীটীকে বড় সাহেবের সহিত পরিচয় করাইতেছেন, সাহেবের মুখে একমুখ হাসি, মামাও যেন টিপিটিপি হাসিতেছেন, কেবল মামার সম্বন্ধী বেচারা যেন কিছু অপ্রতিভ অপ্রতিভ! মামা আমাকে দেখিতে পান নাই, আমি সরিয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইলাম। মামা যখন সসম্বন্ধী সাহেবের নিকট হইতে ফি[illegible] ছিলেন, আমি সম্মুখে পড়িলাম, মামা আর আমার চি[illegible] ইতে পারিলেন না, কেবল গম্ভীরভাবে বলিলে[illegible] হয়ে গেছে!"

আমি একটু রাত্রি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় গিয়া দেখি মামার সেই ঠাকুরদাদা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! মামাকে বলিতেছেন, "বলি একবারেই কি গোল্লায় গিয়েছো! চখের চামড়াটাও কি নাত-বৌয়ের পায়ে দিয়েছো! সুরেনের বাপ তোমাকে মানুষ করে' কাজ-কর্ম্ম করে' দিয়েছিলেন, তুমি তাঁর সম্বন্ধী তাই বুঝি তুমিও তেমনি নিজের সম্বন্ধীর কাজ করে' দিয়ে সে উপকারের শোধ দিলে! অতি উত্তম কার্য্য করেছো!" ব্রাহ্মণ উঠিয়া চলিয়া যান, সম্মুখে আমায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে বাবু, এ বাজারে ভাগ্নে হওয়ার কর্ম্ম নয়, পারিস তো আর জন্মে মামার দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ'য়ে উমেদারী করতে আসিস, এখন ঘরের ছেলে ঘরে যা।"

বৃদ্ধের বচন গ্রহণযোগ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। আমি এখনও সেই কলিকাতায় মামার বাসায় উমেদার!

বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই জন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গনিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কোন স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘ হ্রস্বের নিয়ম বাঙ্গলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চা-ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তর-

ভূমির মত সর্ব্বত্র সমান। জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়। কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না। শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়। একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্ব্বেই অবিলম্বে আর একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

মন্দ পবন, কুঞ্জভবন,
কুসুম গন্ধমাধুরী।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুম কানন
ফুল পরিমল মাধুরী।

ইংরাজিতে অনেক সময় আট দশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।

বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্ব্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়ই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌছায় না। সেই

জন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোন লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বরপূর্ণ না হইলে সাধারণতঃ গ্রাহ্য হয় না।

বাঙ্গলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাঙ্গলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভাল ইংরাজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়-স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এই জন্য তাহাতে সর্ব্বত্রই একপ্রকার দুর্ব্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা পরিমাণে চীৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফল লাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। "যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" দুর্ব্বোধ হইতে পারে কিন্তু "সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়" দুর্ব্বল। "উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে" ইহার পরিবর্ত্তে "উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া" ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাঙ্গলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশতঃ বাঙ্গলায়

পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বার বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যত-ক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সঙ্গীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙ্গালী জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক, এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস, সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দ-নিহিত সঙ্গীতের লাঘব করে। কিন্তু "মনে রৈল সই মনের বেদনা। প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হল না" ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ সুতরাং সংস্কৃতে কাব্য রচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসান বাহুল্য।

...ক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু এ কথা ... যে সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা ...ত্র গান, একেবারেই কাব্য ... করিয়া সুর শুনানই

হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাঙ্গলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাঙ্গলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

ভাসমান।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হচ্চে 'আইডিয়াল্‌' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাতপা নাড়া দেখ্‌তে পাই মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চল[illegible] ফিরছে, যাচ্চে আস্‌চে, খুব একটা সমারোহ। [illegible] যতই আশ্চর্য্য হোক্‌ না কেন, তাতে দর্শক[illegible] মাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্ত[illegible] তাতে মনকে সর্ব্বদা বি[illegible]

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে' মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে' এস্থানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যবরণ দূর করে' অন্তরঙ্গ মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। তখন ভ্রম হয় ইংলণ্ডে পদার্পণ করবামাত্রই এই সব মানুষের সঙ্গে বুঝি পথে ঘাটে সম্মিলন হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরাজ, কেবল বিদেশী;—তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে' থাকে; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্লে "ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে

থালের মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে' বলছিল "ভাই খাচ্চ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল! তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কি কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে! কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার কোন ক্ষুধা বোধ হচ্চে না!" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে' লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চু-চালনা করে' ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্র-লেহন এবং ছুটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে' নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেই রকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজত থালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে' যেতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কি আছে শৃগাল তা ভাল করে' চক্ষেও দেখ্‌তে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা এই জন্য ইংরাজ সমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণ সমক্ষে উদ্ঘাটিত

আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই চার ফোঁটার স্বাদ মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারিনে। সর্ব্বজাতীয় ভোজ বল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও ক্ষুত হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, এখানার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে', হাঁ করে' রাস্তায় ঘাটে র্য্যটন করে', থিয়েটার দেখে', দোকান ঘুরে', কল-কারখানার থ্য নির্ণয় করে'—এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে' আমার শ্রান্তি বোধ হয়েচে। কেবলমাত্র গতি, কোলাহল, সমারোহ অবস্থা-বিশেষে ভাল লাগতে পারে। যদি কখনো জীবন মনের নিতান্ত জড়ভাব উপস্থিত হয় তখন তাকে বাহিরের অবিশ্রাম আঘাতে সচেতন করে' ঈষৎ জীবনের উত্তাপ দান করতে পারা যায়। কিন্তু মন যখন সদা সচেতনভাবে কাজ করচে, চিন্তা করচে, ভালবাস্‌চে, তখন বাহিরের এই বিপরীত গোলযোগে তাকে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত করে' তোলে। বলা আবশ্যক, এই যে গোলযোগ এ কেবল আমাদেরই পক্ষে গোলযোগ, সেখানকার নেটিভদের পক্ষে নয়। সমুদ্রের যে গর্জ্জন সে কেবল সমুদ্র-তীরেই শোনা যায়, জলজন্তুরা বেশ নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করচে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেম্‌স্" জাহাজে একটা ক্যাবিন্ স্থির করে' আসা গেল। পর্শু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান;

এবং আর একজনের জিনিষপত্র একটি কোণে রাশীকৃত
আছে। বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আ
"বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস্।" বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে' ভ
সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দে
সঞ্চার হয় নি। ভাব্লুম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের রো
ঝল্‌সা এবং শুক্‌নো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনে
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেচে! যাদে
মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ট নয় এইটুকু ক্যাবিনের মধ্যে
তাদের দুজনের স্থান সংকুলান্ হবে কি করে? গালে হাত
দিয়ে বসে' এই কথা ভাবচি এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী
ইংরাজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে শুভ প্রভাত
অভিবাদন করলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর
হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা
করচেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয়
ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েচে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ
পরিষ্কার। সূর্য্য উঠেচে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে
আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল।
অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্য-
তীর এবং ভেণ্ট্‌নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড় ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে
একটু লিখ্‌ব তার যো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে
তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরাজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক সর্ব্বদাই
ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে' থাকে।

ত্ত, এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলাতে আসে তখন স্বদেশের হরিণ-নয়নের কথাটা আর বড় মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই এক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েচে আর একসময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয়—ওটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল। যতক্ষণ দূরে আছি কোন বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরাজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে' অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত পরিষ্কার, হীরকের মত উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে, কিন্তু একটি মুগ্ধহৃদয়ের কথা বল্‌তে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণ নয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও কম দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজী সঙ্গীতকে পরিহাস করে' আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে' ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চ্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আর আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভাল লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্ব্বে-

কার কোন্ এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোন কোন পুরু
যাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে
একটা হচ্চে চৌকিতে পিন্ ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেম
মজাও মনে হল না এবং সেইসকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদে
স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখ
যাচ্চে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত
রূঢ়াচরণ করতে পারেন, তাতে ততটা সামাজিক নিন্দার
কারণ হয় না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে ইংরাজ সমাজেও স্ত্রীপুরু-
ষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ আছে বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেচে।
যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক
লীলার মত মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা
সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময়
সেটা ভালবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা
শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই
লঘুগতি তীক্ষ্ণ তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ
করে' আপনার গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং
অনিবার্য্য কারণ বশতঃ নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই
লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের
লঙ্ঘন করে' আনন্দ লাভ করেন। কার্য্যক্ষেত্রে যারা পরস্পর
সমকক্ষ প্রতিযোগী সামাজিক আচারে ব্যবহারে তাদের মধ্যে
সমান ভাবের ভদ্রতার নিয়ম থাকা আবশ্যক, কিন্তু যেখানে সেই
প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্ব্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ
সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। এবং পুরুষের পক্ষে এ একটা
শিক্ষা। স্ত্রীলোকের যে বল সে এক হিসাবে পুরুষেরই প্রদত্ত
বল—মাধুর্য্যের কাছে আমরা স্বাধীন ভাবে আপন স্বাধীনতা

বিসর্জ্জন করি। অবলার দুর্ব্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েচে, এই জন্য যে পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং এই সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চ্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকের কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না—তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজা, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ব'লে' প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্চে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে' পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্ষ্ট-ক্লাশে চড়ে' যাত্রা করচে আর কতকগুলি জড়সড় ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েচে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট এবং উদ্বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের এবং তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসঙ্কোচে গৌরব করে'থাকে এবং তার তিলমাত্র ইত স্তত হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে' জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্ব্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্ব্ব-প্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না—তারা কেবল এইটুকু মাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন যুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত শরীরে পাথার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চ্চার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতা দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় সর্ব্বশেষে উচ্ছিষ্ট খেয়ে পেট ভরে' খাবে,আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে

এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌বে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা পুরুষমানুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে' থাকে এবং পুরুষেরা আপনার বলিষ্ঠ উদার দুর্ব্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে' থাকে, যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্ম্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস থাকলে অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

স্বরলিপি।

বর্ষার দিনে। *

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

---

* 'মানসী' র এই কবিতাটির চতুর্থ শ্লোকটি সুরে বসান হয় ন[illegible]
[illegible]শ্লোকের সুর দ্বিতীয়টারই অনুরূপ। সেই জন্য স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস!

আসিবে কত লোক   কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে   রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

রাগিণী দেশ মল্লার—রূপক।

৬—৪|৬

।১´।২।০।

১ ২ ০
॥ধা পধা মা। গা রা গা সা। রা রমা মা।
॥এ ম ন। দি নে তা রে। ব লা যা

-া ॥
।-া -া -া -গমা। রা মা মা। পা পা পধা -া
।— — — য়। এ ম ন। ঘ ন ঘোর —

ক্র ... ... ব্র (ম্র)
।ঞা ধা ঞা। -া -া -া -া। ধা পধা মা
।ব রি ষা। — — — য়। এ ম ন

।গমা রা গা রসা। রা গমপা মপমগা। -মা -া -া -গমগা
।দি নে ম ন। খো লা যা। — — — য়

।রা মা মা। পা পা পা ধপা। মা পা পা। না না র্সা র্সা
।এ ম ন। মে ঘ স্ব রে। বা দ ল। ঝ র ঝ রে

।না র্সর্রা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা। মা ধঞধা পধপা
।ত প ন। হী ন ঘ ন। ত ম সা

(মু)

। -া -া -া -া॥ সা সা সা। সা সা সা সা। সা ন্সরা রা।
। — — — য়॥ সে ক থা। শু নি বে না। কে হ আ।

। -া -া -া -া। রা রা রা। রা -া ন্া সা। রা সরগা গা।
। — — — র,। নি ভৃ ত। নি — র্জ ন। চা রি ধা।

। -া -া -া -া। গা গা মা। মা পা পা ধপা। মা পা পা।
। — — — র,। দু জ নে। মু খো মু খি। গ ভী র।

। ধা ধা ঞা ঞধা। পা ধা পধা। মা মগা রা গরা।
। দু খে দু খী। আ কা শে। জ ল ঝ রে।

। সা গমগা রগরা। -া -া -া -া। গা রগরা সা। সা সা ন্া ন্সা।
। অ নি বা। — — — র। জ গ তে। কে হ যে ন।

। ধ্ন্া ধ্ন্সা সা। -া -া -া -া। মা পা পর্সা। না -া না না।
। না হি আ। — — — র। স মা জ। সং — সা র।

ক্র … … … … … …

। নর্সা ধনর্সা র্সা। -া -া -া -া। ^ন^র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা।
। মি ছে স। — — — ব,। মি ছে এ। জী ব নে র।

… … … … … … … … বৃ (মু)

। র্সা নর্সর্রা ^র্স^র্রা। -া -া -া -া। র্সা নর্রা র্সা।
। ক ল র। — — — ব,। কে ব লি।

। ঞা ঞধা পা ধপা। মা পধা পা। মা গমগা রা রা।
। আঁ খি দি য়ে। আঁ খি র। সু ধা পি য়ে।

। রপা মা মা। গমগা রা গরা সা। রা রমগা রগরা।
। হৃ দ য়। দি য়ে হৃ দি। অ নু ভ।

। -া -া -া -া। গা রগরা সা। সা সা ন্া ন্সা। ধ্ন্া ধ্ন্সা সা।
। — — — ব,। আঁ ধা রে। মি শে গে ছে। আ র স।

। -া -া -া -া। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা।
। — — — ব। তা হা তে। এ জ গ তে। ক্ষ তি কা।

। -া -া -া -া। ধা র্সা নর্সা। ধা ধা পা পঃধপঃ।
। — — — র,। না মা তে। পা রি য দি।

। মা মগা মপমগা। মা -া -া-গমগা। রা রপা পা।
। ম ন ভা—। — — — র। এ ক দা।

। মা গমগা রা গরা। সা রগা রগা। সা সরা ন্া সা।
। গৃ হ কো ণে। শ্রা ব ণ। ব রি ষ ণে,।

। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা। -া -া -া -া।
। ছ্ ক থা। ব লি য দি। কা ছে তা। — — — র,।

। ধা র্সা নর্সা। ধা ধঞধা পা পধা। মা মগা মপমগা।
। তা হা তে। আ সে যা বে। কি বা কা।

(ব)

। মা -া -া -া। মা পা পর্সা। না না না না। নর্সা ধনর্সা র্সা।
। — — — র। ব্যা কু ল। বে গে আ জি। ব হে বা।

ক্র ... ...

। -া -া -া -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা। নর্সা নর্সর্রা র্সর্রা।
। — — — য়,। বি জু লি। থে কে থে কে। চ ম কা।

... ... বৃ (মৃ)

। -া -া -া -া। র্সা নর্সর্রা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা।
। — — — য়। যে ক থা। এ জী ব নে।

। মা পধা পা। মা মগা রগা সা। রমা মা মা।
। র হি য়া। গে ল ম নে। সে ক থা।

। গমগা রা গরা সা। রা রমগা রগরা। -া -া -া -া।
। আ জি যে ন। ব লা যা। — — — য়।

ক্র ... ...
। রা মা মা। পা পা মপধা -া। ঞা ধা ঞা।
। এ ম ন। ঘ ন ঘো র। ব রি যা।

... ... বু ক্র ... ... মৃ
। -া ধঞর্সা ঞর্সঞধা ঞা ॥
। — — — য় ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) স, র, গ, ম, প, ধ, ন, এই সপ্ত সুর।

(২) স, র, গ, প্রভৃতি স্বরাক্ষরে আকার যোগ করি-াই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। ঃ=অর্দ্ধমাত্রা; যথা স্বরলিপির ১৯ পংক্তিতে পঃ ধপঃ; অর্থাৎ পঃ অর্দ্ধমাত্রা ও ধপঃ একত্রে অর্দ্ধ-মাত্রা; পঃ ও ধপঃ মিলিয়া এক মাত্রা; বলা বাহুল্য "ধপঃ"-র ধ ও প প্রত্যেকে কাজেই সিকিমাত্রা।

(৩) ঞ=কোমল ন।

(৪) উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্ ও খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

(৫) পার্শ্বের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন—ফিরিয়া গিয়া যেখানে একেবারে থামিতে হইবে কিম্বা অন্য কলি ধরিতে হইবে তাহার শিরোদেশে যুগল-ছেদ বসে। অন্য কলি ধরিবার সময় কখন কখন আস্থায়ীর শেষ সুরের একটু পরিবর্ত্তন হয়—সেই পরিবর্ত্তিত সুর শিরোদেশে বসান হয়। যথা, দ্বিতীয় পংক্তির "-গমা"র উপরে "-া" বসিয়াছে। অর্থাৎ "গমা"র পরিবর্ত্তে "ম"-এর টান্‌টিই চলিবে।

(৬) রূপক তালটি অযুগ্মমাত্রিক; প্রতি তাল-বিভাগে একবার তিন মাত্রা, একবার চার মাত্রা করিয়া পর্য্যায় ক্রমে আসে; তাই ৩-৪।৩ এই তালাঙ্ক চিহ্নে ৩-৪ এইরূপ লেখা আছে; ।- র ডাহিন দিকে যে ৩ লেখা আছে তাহার অর্থ এই;—১, ২, ৩ খুব দ্রুত উচ্চারণ করিলে যতটা সময় লাগে এই গানের প্রত্যেক মাত্রা ততটা কাল স্থায়ী। এই পদ্ধতি অনুসারে, কতটা "বিলম্ব" কতটা "দ্রুত" তাহা যথাযথরূপে ব্যক্ত হয়।

(৭) ক্র-বৃ অর্থাৎ ধ্বনির ক্রমশঃ বৃদ্ধি; ক্র-মৃ = ক্রমশঃ মৃদু, ব = সবলে; মৃ = মৃদুভাবে। এই অলঙ্কার-চিহ্ন শিরোদেশে প্রয়োগ হয়।

জীবিত ও মৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হাটের জমিদার শারদাশঙ্কর বাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির তৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি ছিল। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না;—তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবী নাই কেবল স্নেহের দাবী—কিন্তু কেবলমাত্র সেই সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোট ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কি কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে এই জন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ,বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছুই নাই। পূর্ব্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে; সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"যাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানের সেই কুটীরে গিয়া

উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে, কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—"দিদি"—অন্ধকার

ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় যা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখের পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং দূরের তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে

পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃত-দেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেথানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূত-পূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্য-ক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়া-ইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয়

তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়। সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল। পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত

ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক-দণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকট-বর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দো-বস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুর-বাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব!"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিক-

ক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল, যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ, অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কি উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল?

আবার আর এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিক্‌কে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এই জন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক একদিন চীৎকার করিয়া উঠিত—এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন তখন যেখানে সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্দ্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল—"দিদি, দিদি, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো! আমাকে এক্‌লা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল—"হাঁ

গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুর-ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝা-ইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে!"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহা-দিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদ-ম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি!—এই বলিয়া তিনি কোনরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতি-কর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণি-হাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করি-বেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখি!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়াকপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন! তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি—আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর কোন স্থান গড়িয়া রাখেন নি তখন কাজে কাজেই, বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই!"

এম্‌নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল, যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি নিশিন্দাপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল!" শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড়ে পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে!"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনিনা, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি শুনিতে কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"—

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না। উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে। একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম!" আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!" অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।" ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল—"সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করিয়াছি! আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব!" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওগো, আমি তবে কোথায় যাব!"—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া নিশিন্দাপুরে ফিরিয়া গেল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল। বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া

পন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে, একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অৰ্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, জল দে!"—আ মরিয়া যাই! সোনা আমার তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস্ নাই! তাড়া-

তাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উ তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল। যতক্ষণ ঘুমে ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"—কাকিমা কহিল "হাঁ খোকা!" "আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?" ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, তুই যা!"—কাদম্বিনী আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই।—সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই। ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি!"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন "ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!"—তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!" বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন বলিল "এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!" শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল! তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

লোক-চেনা।

ইতিপূর্ব্বে "বালক"-পত্রিকায় মুখ-চেনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। কিন্তু মুখ-চেনা অপেক্ষা লোক-চেনা আরও ব্যাপক; ইহার মধ্যে মুখচেনা, মাথা-চেনা, আকৃতি-চেনা, প্রকৃতি-চেনা সকলই আইসে। আমরা সকলেই একটু না একটু লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়া থাকি—কখনও চিনিতে পারি, কখনও বা ভুল করি। অধিক স্থলেই আমরা মোটামুটি একরকম চিনিতে পারি। একজন লোককে প্রথম দেখিবামাত্রই তাহার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা আমাদের মনোমধ্যে স্বতই উদয় হয়; এই ধারণা সকল সময়েই যে ঠিক্ হয় একথা বলা যায় না। লোকের সহিত যাহার যত বেশি ব্যবহার, লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যার যত বেশি, তার সেই পরিমাণে লোক-চেনায় কম ভুল হয়। লোকের সহিত ব্যবহার থাকিলেই যে সকলের লোক চিনিবার শক্তি হয় তাহাও নহে। কেহ কেহ চিরজীবন লোকের সহিত ব্যবহার করিয়াও লোক চিনিতে পারে না—কেহবা স্বভাবতই লোক চিনিতে পটু। লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখি এখনও লোকচরিত্র-বিদ্যা অসম্পূর্ণ—এখনও উহা বিজ্ঞানের সামিলে আসে নাই। সেই জন্য তাহাদের সব কথাই যে বেদ-বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। নিয়মগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-ক্ষেত্রে মিলাইয়া দেখিবেন—ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্ অন্তত সব জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার একটা অভ্যাস জন্মিবে—পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হইবে। য়ুরোপীয়-

দিগের তুলনায় আমাদের এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি কম। আমরা বাহিরের সকল জিনিসই যেন চোখ বুজিয়া দেখি,— বহির্দৃষ্টি আমাদের নাই বলিলেই হয়, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিই প্রবল। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ আচার্য্যেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ঠিক না হইলেও তাঁহাদের বিবৃত মূলতত্ত্ব যে অকাট্য সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের একটি মূল কথা এই—"যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি; যেমন প্রকৃতি তেমনি আকৃতি।" একজন কুস্তিগির পালোয়ানকে দেখ—আর একজন টুলো ভট্টাচার্য্যকে দেখ— উহাদের আকৃতি দেখিবামাত্র উহাদের প্রকৃতি একেবারেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আর একটি মূল কথা এই, ব্যক্তি-বিশেষ বা জীববিশেষের যেরূপ দেহের আকার তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও প্রত্যেক অংশও সেই দেহের অনুযায়ী—সমস্তের সহিত প্রত্যেক অংশের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একজনের কেবল হাতের তেলো দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার সমস্ত দেহের প্রকৃতি কিরূপ। Agassiez প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূস্তর-নিহিত একটি অস্থি-খণ্ড দেখিয়াই বলিতে পারেন, সে অস্থিটি কোন্ শ্রেণীয় জীবের। লোক-চেনার উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশি কথা বলা অনাবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, আদালতে, বর-কন্যা-নির্ব্বাচনে, কর্ম্মচারী-নিয়োগে লোক-চেনা যে বিশেষ কাজে আইসে তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব আর বেশি বাক্যব্যয় না করিয়া আসল কথায় আসা যাক্।

একজন লোককে দেখিবামাত্র প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার দৈহিক প্রকৃতি কিরূপ, দৈহিক প্রকৃতির অবস্থা জানিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। আমাদের আয়ু-

র্ব্বেদে তিন প্রকার দৈহিক ধাতুর উল্লেখ আছে—বাত, পিত্ত ও কফ। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য তাহার বায়ু-প্রকৃতি, যাহার শ্লেষ্মা বা কফের প্রাধান্য তাহার কফ-প্রকৃতি, যাহার পিত্তের প্রধান্য তাহার পিত্ত-প্রকৃতি। পুরাতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কতকটা এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। আমরা যাহাকে বায়ু-প্রকৃতি বলি, তাঁহারা তাঁহাকে স্নায়ু-প্রকৃতি বলিতেন আমরা যাহাকে কফ-প্রকৃতি বলি তাঁহারা তাহাকে লিম্ফ্যাটিক্ অর্থাৎ রস-প্রকৃতি বলিতেন—কিন্তু পৈত্তিক প্রকৃতির নামকরণে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আমাদের যা তাঁহাদেরও তাই। তবে, তাঁহাদের আর একটি শ্রেণী বেশি ছিল—তাহা রক্ত-প্রকৃতি। আধুনিক শিরোতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আবার ইহাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাহা এই—(১) মনোময়ী প্রকৃতি; (২) প্রাণময়ী প্রকৃতি (৩) বলময়ী প্রকৃতি। প্রাণময়ী প্রকৃতির অন্তর্গত রক্তময়ী ও রস-ময়ী প্রকৃতি। যাহাদিগের দেহে অস্থি ও পেশীতন্ত্রের প্রাবল্য তাহাদিগেরই বলময়ী প্রকৃতি। পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে হাই-লাণ্ডীয় স্কট ও সুইস্‌জাতি এই লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের পাঠান আফ্‌গান ও শিখদিগেরও বলময়ী প্রকৃতির প্রধান্য। এই প্রকৃতির লোকদিগের মোটা মোটা হাড়, পাকানো পাকানো দৃঢ় পেশী—ইহাতে করিয়া শরীর বলবান ও কষ্টসহ হয়। যাহাদিগের বলময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদিগের স্বভাবও প্রবল; তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ; কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহারাই নেতা। চিন্তাশীলতা অপেক্ষা তাহাদিগের দর্শন-পরতা অধিক। চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণ যে কার্য্যোপায়-প্রণালী স্থির করেন, এই প্রকৃ-

তি লোকেরা তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। তাহারা উদ্ধত ও ভুস্বাকাঙ্খী; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সকল জাতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহারা অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। বলময়ী প্রকৃতির আবার দুই প্রকার খাঁচা আছে—এক পেশীময়ী—আর এক অস্থিময়ী। যে শরীরে অস্থির প্রাবল্য—অথচ পেশী কম, তাহাদিগের গঠন-রেখা কোণ-বিশিষ্ট ও খোঁচাল—তাহারা বড়ই অলস; তাহাদিগকে শীঘ্র চাগান যায় না, কিন্তু একবার চাগাইয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের আবার থামানো যায় না। এই খাঁচার লোকদিগের কাজ-কর্ম্ম, চলা-ফেরা বড়ই অশোভন ও অনিপুণ, ইহাদের রকম-সকমও বর্ব্বরের ন্যায়। অস্থি ও পেশীর যখন সামঞ্জস্য হয় তখনই বলের সহিত শোভনতা ও পটুতা মিলিত হয়, তখনই বলময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়।

যাহাদিগের দেহে পুষ্টি-তন্ত্রের প্রাধান্য—অর্থাৎ পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্ত-পরিচালন যন্ত্রসকল অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগেরই প্রাণময়ী প্রকৃতি। যাহাদের বক্ষদেশ প্রশস্ত, যাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্তচালন যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগকে রক্ত-প্রকৃতি বলা যায়। তাহারা একটুতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে ও সর্ব্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তাহারা যেরূপ চিরোৎফুল্ল ও দৈহিক স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাহাতে অতিরিক্তমাত্রায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দিকে তাহাদিগের ঝোঁক থাকা অসম্ভব নহে।

যাহাদের ঔদরিক যন্ত্র সকল বেশি কার্য্যকরী, তাহারা রসময়ী প্রকৃতির লোক—তাহারা লম্বোদর, নাদুস্-নুদুস্ ও গোলগাল; তাহাদিগের রক্ত-চালনা ঢিমা-চালে সম্পন্ন হয়—তাহাদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও মন্দীভূত, ক্ষীণ ও আলস্য-জড়িত। এই প্রকৃতির

লোকদের না আছে মনের বল, না আছে শরীরের বল। ইহারা নিদ্রালু, অলস, ও উদর-পরায়ণ—রোগ দ্বারা ইহারা শীঘ্র আক্রান্ত হয়। কিন্তু রক্তময়ী ও রসময়ী প্রকৃতির যদি সামঞ্জস্য হয় অর্থাৎ বক্ষ ও উদর এই উভয় প্রদেশেরই যন্ত্রগুলি যদি যথা-নিয়মে কার্য্য করে তাহা হইলে প্রাণময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়—শরীর স্বাস্থ্য ও বলের বৃদ্ধি হয়। ভৌতিকের দিকে একটু বেশি টান হয় বটে—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও একটু বেশি সক্রিয় হইয়া উঠে সত্য—কিন্তু ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত বৃত্তির সংযোগ থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বেশি মাথা তুলিতে পারে না। যাহাদের প্রাণময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদের শারীরিক উদ্যমের কাজ ভাল লাগে ও তাহাদের মানসিক ক্রিয়া সকলও সহজ ও বহুপথগামিনী; দৃঢ়তা অপেক্ষা তাহাদিগের মনের স্থিতিস্থাপকতা সমধিক। ইহারা যতটা পরিশ্রমী ততটা অবিরতচেষ্ট নহে অর্থাৎ কোন বিষয় সংসাধনের জন্য ইহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে পারে না। ইহারা চট্ করিয়া একটা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে, ইহাদের কল্পনা তেজস্বিনী, নিজ মনের ভাবও ইহারা শীঘ্র ও সহজে প্রকাশ করিতে পারে—কিন্তু ইহাদের গভীরতা অপেক্ষা চটক্ বেশি। এক বিষয়ে ইহারা অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না—কারণ, ইহারা বৈচিত্র্য ভালবাসে। ইহাদের রিপুবেগ প্রবল কিন্তু কোনও ভাবই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না—সর্ব্বদাই মেজাজের পরিবর্ত্তন হয়। ইহারা প্রফুল্ল, উচ্ছ্বাসময়, খোলা-প্রাণ, প্রিয়-দর্শন; ইহারা উপাদেয় আহারাভিলাষী, আরাম ও আয়েসের অনুরাগী। বল-প্রকৃতি লোক অপেক্ষা ইহারা সহজে কুপথগামী হইতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির শাসনাধীনে থাকিতে পারিলে এই প্রকৃতির লোকেরা বড় সুখী হয়। যেমন নিজে

যাঁহারা মনোময়ী
া প্রশস্ত ও উন্নত—
ার। তাঁহাদের মুখ
হইয়া মুখ ক্রমশঃ সরু
াব ও ভাষা সমুন্নত ও সুরুচি-
য্য, মলিন ও ইতর তৎপ্রতি তাঁহারা
াঁহারা হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করেন তাহা
ুস্পষ্ট ও সুতীব্র এবং তাঁহাদের ধারণা ও কল্পনা
দ্রুতগতি; তাঁহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় যতটা সুখানুভব করেন অন্য প্রকৃতির লোক ততটা করে না। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের অনুশীলনে তাঁহারা অধিক রত। সাহিত্য, কবিতা, চারুশিল্প তাঁহাদিগের সাধের জিনিস।

মন প্রাণ বল এই ধাতুত্রয়ের এক একটি কাহারও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাই এতক্ষণ বর্ণনা করা হইল; কিন্তু আসলে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে দেখা যায় না; প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিতে এই তিন ধাতু বিমিশ্র ভাবে থাকে—কাহারও কোনটা কম কাহারও কোনটা বেশি। এই ধাতুত্রয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য অতি বিরল; তবে কাহারও কাহারও প্রকৃতি, সামঞ্জস্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর। এই ধাতুত্রয় তাহাদের প্রকৃতিতে এরূপ ভাবে মিশ্রিত থাকে যে বুঝা দুর্ঘট উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় তিনটির মধ্যে দুইটি প্রবল ও একটি ক্ষীণতর; এই ধাতুত্রয়ের বিভিন্ন সমাবেশ অনুসারে কাহারও বা মনোপ্রাণময় প্রকৃতি কাহারও বা বলপ্রাণময় প্রকৃতি—কাহারও বা মনোবলময় প্রকৃতি—এরূপ নানাপ্রকার

মিশ্র প্রকৃতি উৎপন্ন
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ আ
হইয়া পড়ে। মোট কথ
শ্যক যাহাকে চিনিতে চেষ্ট
মোটামুটি তাহার প্রকৃতি জা
অবয়বাদি পর্য্যালোচনা করা আবশ্য

সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ।

একটা জিনিষ যথার্থ কি অর্থাৎ সেটা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা' নির্ণয় করতে গেলে, তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে' দেখে' তার স্বরূপগত গুণ থেকে তার অবস্থাঘটিত গুণগুলো বিচ্ছিন্ন করে' দেখা আবশ্যক। সাহিত্য কি তা স্থির করতে গেলে তাকে ভিন্ন অবস্থায় দেখে বেছে নিতে হবে, তার কোন্ গুণগুলি নিত্য এবং কোন্ গুণগুলি ক্ষণিক। যদি কোন লেখার এমন কোন গুণ পাই যার অভাবেও আমরা তাকে সাহিত্য বলে' গণ্য করতে পারতুম তবে তাকে সাহিত্যের স্বরূপগত গুণ বলা যেতে পারে না। তুমি যাকে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধতত্ত্ব বল্‌চ সেই গুণটি সব সময়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় কি না এটা দেখ্‌লে আমাদের মীমাংসার অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

আমি লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন সাহিত্য বিশেষ কিছু জানিনে তাই এ বিষয়ে জোর করে' কিছু মতামত দিতে পারচিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই মূলতত্ত্বটি একটি আধু-

নিক সৃষ্টি। পুরাতন সাহিত্যে ছিল কি না সন্দেহ, আর যদি বা থাকে আজকালকার চেয়ে ঢের কম।

অবশ্য আমি এমন কথা বল্‌তে চাইনে যে সাহিত্যের খুব আদিম সময়েও এই মূলতত্ত্ব একেবারে ছিল না। কেননা সমাজ ব্যতীত সাহিত্যের সম্ভব নয়, আর সমাজের ভিত্তিই হচ্চে নীতি—এবং নীতির মূল হচ্চে এই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান। এমন কি আমরা চখে যখন কোন জিনিষ দেখি তদ্দ্বারাও বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তপ্রর্কৃতির একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই হিসাবে তুমি যদি বল যে সাহিত্যের মধ্যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক তাহলে ও-বিষয়ে আমার বিশেষ কোন কথা নাই—কেন না মানুষের প্রত্যেক কার্য্যে এবং চিন্তায় সেই মূলতত্ত্ব অবলম্বন থাকা চাই। চিন্তার অর্থই মনের সহিত অ-মনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বলে' একটা বিশেষ উল্লেখ করতে গেলে এই সাধারণ মূলতত্ত্ব ছাড়াও আর একটা কিছু মনে উদয় হয়।

এই জিনিষটা ঠিকটি কি তা বোঝানো শক্ত কিন্তু আজকালকার প্রধান কবিদের লেখা পড়লে অনেকটা পরিষ্কার হয়। শে... বল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই বল, টেনিস্‌ন্‌ই বল, এমন কি বায়রণও, এঁ... সকলেই আমি কি এবং এই জগতের মধ্যে আমার স্থান কোথা... সৌন্দর্য্য ভালবাসা ইত্যাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ... ভাবটা নিয়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই ব্যতিব... ভাবটাকেই তুমি বোধ হয় মূলতত্ত্ব হিসাবে ধরচ। এ ভাব... কিন্তু আজকালই দেখা যায়। পুরাকালে সাহিত্যকারগণ আ... দের চখের সামনে সুন্দর ছবি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন—... গ্রীক সাহিত্য যতদূর দেখেছি তাদের লেখার সঙ্গে ...

চনার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমার বোধ হয় সংস্কৃত
াহিত্যেও এইরূপ সরলভাবে সৌন্দর্য্যবিকাশের প্রতিই লক্ষ্য
ছল। আজকাল কিন্তু আমরা কিছু বেশি বিশ্লেষণের পক্ষপাতী
য়ে পড়েছি। আমাদের দার্শনিক ভায়াদের উপদ্রবে আমরা
সৌন্দর্য্যকে সুন্দর ভাবে দেখে' তৃপ্তি লাভ না করে' তার বুক
চরে তার কঙ্কাল বাহির করি। এর একটা কারণ হচ্চে
আজকাল আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে এসেচে।
তার সঙ্গে খানিকটা সন্দেহ মিশে গেছে। তাতেই কিন্তু বিশ্বাসের
জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দিয়েচে। বিশ্বাসকে আত্মরক্ষার জন্য
যুদ্ধ করতে হচ্চে বলে তার অস্তিত্বটা সকলের কাছে প্রবলরূপে
প্রতীয়মান হচ্চে।

একহিসাবে কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যে সেই সময়ের মূলতত্ত্ব
এবং লেখকের নিজের মূলতত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পাবেই।
ানুষ বর্ণনা করতে গেলেই তাকে সমাজের অঙ্গীভূত রকমে
না করতে হবে। সুতরাং কি ভিত্তির উপর সে সমাজ স্থাপিত
ং তখনকার কি আইডিয়াল্ তা কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত
ব। লেখকও তার নিজের আইডিয়াল নিজের বিশ্বাস নিজের
তত্ত্ব তার মধ্যে খানিকটা প্রকাশ না করে' থাক্‌তে পারে না।
জন্যই এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের দর্পণ। আজ-
ল আমাদের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করবার একটা চেষ্টা আছে তাই
যুগের সাহিত্য থেকে ইহাকে সংশয়াপন্ন এবং অন্তর্দর্শনশীল
ল বলে' আমরা জান্‌তে পারি। এই হিসাবে এক এক যুগের
হিত্য সেই সেই যুগের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে।

যদিও এই মূলতত্ত্ব প্রকাশ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী
সাহিত্যের স্বরূপগত বলা যেতে পারে না। মনে

আমি এমন সুনিপুণ সাহিত্য-জালিয়াৎ যে আমি এই উন-
শতাব্দীতে বসে' মহাভারতের সময়ের একটা বিষয় নিয়ে
মহাভারতের লেখার মতন মহাকাব্য লিখতে পারতুম। তাকে
না সাহিত্য বল্‌বে? অথচ এর মধ্যে কি মূলতত্ত্ব রইল?
আমার নিজের নিজত্ব রইল না—থাক্‌লে সেটা দূষণীয়—আর
লেখকের সমসাময়িক মূলতত্ত্ব তাও তাতে নাই—যদি কিছু থাকে
তবে সেটা প্রাচীনকালের মূলতত্ত্ব।

আমি তোমাকে অনেক রকম উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার
চেষ্টায় আছি যে নিজের নিজত্ব কিম্বা রচনাকালীন সময়ের বিশে-
ষত্ব প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে স্বরূপগত আবশ্যকীয় নয়।

ঠাকুরঘর।

বড় ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা
গায়ে পাতিয়া লয়। বিশেষতঃ যদি ছুটো অপবাদের কথা
থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে সকলেই মনে
করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভারি খুসি
হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর
মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার
প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে—নতুবা এমন লোক আর
কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহঙ্কারের উপর স্বভাবতই ছুটো শক্ত কথা
বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে ত খুসি
হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই ছুই দশজন নয়

একেবারে দেশের লোকে তাড়া করিয়া আসে। ইহার কি ?

তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া খাইতেছি ? অর্থাৎ যেটা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া উচি গোপনে তাহার মধ্য হইতে উপাদেয় জিনিষটি লইয়া নি ভক্ষণ করিতেছি ? আসলে, দেবতার প্রতি ষোলআনা বিশ্বাসই নাই ?

যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।

যে কারণেই হৌক্, আমরা সহজে ঠাকুরঘর আর ছাড়িতে চাই না। কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তর কাজ, এবং অনেক চিন্তা, এবং বাধাবিপত্তির সঙ্গে কেবলি সংগ্রাম। কিন্তু ঠাকুরঘরে কোন কাজকর্ম্ম নাই ; কেবলি স্তবপাঠ এবং ঘণ্টানাড়া। অথচ নিজের কাছে এবং পরের কাছে অতি অল্প চেষ্টায় পরম পবিত্র ভক্তিভাজন হইয়া উঠা যায়।

যদি কেহ বলে, ওহে, কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ। আমাদের ঠাকুর বলেন, আমরা জাত-পুরোহিত, কাজকর্ম্মকে আমরা হেয় জ্ঞান করি ; আমাদের পক্ষে সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এমন উন্নত মহানুভাবে বলেন শুনিয়া তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ প্রমাণ করিয়া বলি—যে আজ্ঞা ! আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না ; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন্। ম্লেচ্ছদের মত আপনি কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে সকল বচন বচনা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও

বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন্ এবং যে-গুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্য্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান্ এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করুন।

পঁহু।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্মাননীয়েষু।

পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের সাধনায় আপনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন আমার বোধ হয় সেটী ভুল। আপনি, দীনেন্দ্র বাবু ও বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। পুনঃ হইতে পঁহু যে হইতে পারে না সে সম্বন্ধে আপনারও সন্দেহ আছে। যেখানে পুনঃ অর্থ না করিলে পাঠ অসংলগ্ন হয় সেখানে পাঠ দুষ্য। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি, হিন্দীভাষায় তিনি কবিতা লিখিয়াছিলেন, অন্যে বাঙ্গলা ভাষায় তাহা অনুবাদ করেন। হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া বটতলার ছাপা পদকল্পতরু হইতে বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রথম বিদ্যাপতি স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত করেন। সেই গ্রন্থ-খানি হইতে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গ্রন্থের উৎপত্তি। তাহা হইতে বাবু সারদাচরণ মিত্র বাদসাদ দিয়া আর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া মিলাইয়া কেহ বটতলার পদকল্পতরুর ভ্রম সংশোধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বোধ হয় না।

পুঁথি নকল করা পূর্ব্বে একটী ব্যবসায় ছিল। যখন বই ছাপা হইত না তখন এইপ্রকার ব্যবসায়ী লোককে দিয়া নকল করাইয়া লোকে পুস্তক সংগ্রহ করিত। লেখকদিগের হাতের লেখা ভাল হওয়া যত প্রয়োজনীয় ছিল, বানান শুদ্ধ হওয়া তত আদরণীয় ছিল না। বস্তুতঃ বানানের শুদ্ধতার আদর আধুনিক। অদ্যাপি হিন্দী লেখায় বানানের শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি পণ্ডিতদিগেরও নাই। হাতের লেখা পুঁথির বানান যেমন অশুদ্ধ একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করাইয়া দেখাই। বস্তুতঃ আমার এই পত্রেই বানান কত ভুল হইতেছে দেখিলে প্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করাইয়া দেখাইবার আবশ্যকতা থাকে না। পাছে কেহ মনে করেন এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে লোকের বানানের শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি অধিক ছিল, তাই দেখাইতে হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরগুলি এখনকার অক্ষর হইতে ভিন্ন ছিল। সেগুলি দেখাইবার আবশ্যক নাই, সেগুলিকে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বানান যথাযথ নকল করিয়া শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। যে পুঁথি হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম সেখানি দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের লেখা।

জথা রাগ—

অলখিতে হাম হেরি বিহসি গোরি।
জনু বয়নে ভেল চান্দ উজোরি॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥
কাহে শুন্দরি কেতুয় জান।
আকুল কিএ গেও হামারি পরাণ॥ ধ্রু
লিলা কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনি চকিত নিহারি॥ ইত্যাদি।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। প্রাচীন পুঁথি দেখিলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবেক। গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি প্রায় শুদ্ধ। কিন্তু নকলকার ও বটতলার ভূত ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না।

বানানভুল সংশোধন না করিয়া বিদ্যাপতির অনুবাদের ভাষার আনুমানিক অর্থের উপর নির্ভর করিয়া পুনঃ হইতে পঁহু স্থির করিতে হইলে শব্দবিদ্যাকে বিসর্জন দিতে হয়। এইরূপে পঁহু ও প্রভু শব্দের অর্থগত কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য আছে কিন্তু শব্দশাস্ত্রের কোন সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না। রবীন্দ্র বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের টীকা দেখিয়া প্রভু-শব্দ স্থির করিয়াছেন আমার প্রেমহারের টীকা দেখিলে বুঝিতেন বঁধুশব্দ হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধু বঁধু এবং পঁহু একই শব্দ। পঁহু শব্দ কখন কখন পহু রূপে লিখিত হয়। অদ্যাপি মিথিলায় সিংহ বা সিঙ্ঘ না লিখিয়া লোকে সিঁহ লিখিয়া-থাকে। এইরূপে লেখার দোষে ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ার্সন সাহেবও একবার প্রতারিত হইয়া শিবসিংহকে শিবসিঁ ও শিবসিঁহ লিখিয়া ছিলেন। সে যাহা হউক এই পহু শব্দের রূপান্তর পাহুন শব্দ কুটুম্ব বন্ধু ও আত্মীয় অর্থে বিহারের সর্ব্বত্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব লিখিয়াছেন পঁহু বা পহু শব্দের অর্থ a husband, a beloved সুতরাং পঁহু ও প্রভুশব্দের কিয়ৎ-পরিমাণে যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে ইহা ঠিক।

বন্ধু ও বঁধু যে একই শব্দ, অনুনাসিক ন যে চন্দ্রবিন্দুতে অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হয় এ কথা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। বঁধু ও পঁহু যে একই শব্দ ইহা দেখান আবশ্যক। পঁহু শব্দের অর্থ প্রভু স্বামী প্রিয়জন ইহা রবীন্দ্র বাবু, দীনেন্দ্র

বাবু, অক্ষয় বাবু সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার নীচ শ্রেণীতে এই গানটী শুনা যায়।

বঁধু আছে উপবাসী, সরু চিড়ে কুটায়েছি
দুধকে পাঠায়েছি কলসী।
বঁধুকে খাওয়াব ভাত, কোথায় পাব মাগুর মাছ
কালীদহে ফেলাচেছি জাল।

এই বঁধু স্বামী না স্ত্রী না কুটুম্ব? বঁধু শব্দ প্রিয়ার প্রতি কি ব্যবহার হইত না?

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনুক রাগ এহন সন লগইছি
জাগল পয় পচোবান।
জুড়ি রহনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহিঁ আন।
এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহি হোয় যে জান।

বিদ্যাপতি।

বঁধু ও পঁহু যে একই শব্দ ইহা বিদ্যাপতির একটী গানে স্পষ্ট দেখা যায়।

নেহক বন্ধু সেহো ছুটি গেল
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল।

'ধ' যে 'হ'-তে এবং 'ব' যে 'প'-তে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা সকলই জানে। আমরা যাহা ধড়পড় বা ধড়ফড় বলি বিহারীরা তাহাই হড়বড় বলে। আমরা অাঁকুবাঁকু বলি সাঁওতালেরা হাঁকোপাঁকো বলে। রাধিকা রাই বা রাহী শব্দে পরিণত হইয়াছে, সুধায়লি সোহায়লি হইয়াছে। বন্ধ শব্দ বাহু ও বহু হইয়াছে। হিয়া শব্দ হৃদয় বা ধীয়া হইতে হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না। বধির বহিরা হইয়াছে। বধূ বহু হইয়াছে, বিধি বিহি হইয়াছে।

স্বরের ক্রমবিকাশে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয়। ক্রমবিকাশের পর্য্যায় অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালা গ্রথিত হইয়াছে। ক খ গ ঘ স্বরের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। যেরূপ সংযোগে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয় সন্ধিসূত্রে তাহার উল্লেখ আছে। এগুলি দেবভাষাকথক সভ্যজাতির বাগ্‌যন্ত্রের উন্নতির পরিচয় দেয়। কিন্তু অপর জাতির অনুন্নত কণ্ঠে তাহারা কি রূপ ধারণ করে এবং সংযোগের বৈপরীত্যে কিপ্রকার বর্ণসঙ্কোচন হয় তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ক স্থানে গ, প স্থানে ব কথন্ হয় ইহা পাওয়া যায় কিন্তু গ স্থানে ক ও ব স্থানে প কখন্ হয় তাহা পাওয়া যায় না। হয়ত এরূপ অপভ্রংশতা নিবারণ করিবার জন্য অথবা ব্যাবৃত্তি অপেক্ষা সঙ্কোচন বিরল বলিয়া বৈয়াকরণেরা ইহাদের প্রক্রিয়া সূত্রবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাই বলিয়া ব্যবহারে গ স্থানে ক, জ স্থানে চ, দ স্থানে ত বা ব স্থানে প নিতান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তিকা বত্তিকা বত্তী (বাতি) ও পলতি হইয়াছে।

বল্লী পল্লী হইয়াছে।

বাত (সংবাদ) পাতা হইয়াছে।

বাবা বাপ হইয়াছে।

বাবু বাপু হইয়াছে।

বারি পানি হইয়াছে।

অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নাই কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

সে যাহা হউক বিদ্যাপতির বাঙ্গালা অনুবাদক প্রাচীন

মৈথিলী গ্রন্থে পঁহু শব্দ দেখিয়া তাহাই বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়াছেন। পাঁহুন শব্দ অদ্যাপি বিহারে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি বঁধু ও পঁহু উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন, উভয় শব্দই প্রিয়তম অর্থে পুরুষ ও নারীর প্রতি ব্যবহার হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রমতে বন্ধু হইতে বঁধু, বঁধু হইতে বঁহু, বঁহু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রভুশব্দ হইতে পঁহুশব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার এই বোধ হয়। কিন্তু আমার যে ভ্রম হয় নাই তাহা আমি বলিতে পারি না।

মধুপুর।
২১ জুন। ১৮৯২।

বশম্বদ
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
মান্যবরেষু।

আপনি বলিয়াছেন "অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।"

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এই জন্যই বাঙ্গলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে "শব্দশাস্ত্রের কোন সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।" কিন্তু যে হেতুক বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই ইহার সূত্র নির্দ্ধারণ করার কোন উপায় নাই। অতএব বাঙ্গলার আরো দুই চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি, আপনার তর্কটা এই, যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোন সংশ্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। "বন্ধু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই। যথা—রুক্ষ হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শঙ্খ হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্ত্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্ব্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণতঃ অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই একটি শব্দ উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—শৈবাল হইতে শেঁয়লি, শ্রাবণ হইতে সাঙন।

তবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ধ" যেমন "হ"য়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তেমনি পবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ভ" ও অপভ্রংশে "হ" হইতে পারে এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোন মতান্তর নাই। তথাপি দুই একটা উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য—যথা, শোভন হইতে শোহন। গাভী হইতে গাই। (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই।) নাভি হইতে নাই। ("হি" হইতে "ই" হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোন ভ্রম না থাকে তবে, "প্রভু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহুর উদ্ভব হইতে আটক নাই আপনি তাহার

প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত "পঁহু" শব্দ বিদ্যাপতির কোন মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি? আমি ত গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলা-প্রচলিত পুঁথিতে কোথাও "পহু" ছাড়া "পঁহু" দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বহু, বহু হইতে পহু এবং পহু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙ্গালীর মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে ইহাই আমার নিকট অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর একটা কথা এই যে,—বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর", "রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ," "নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান" ইত্যাদি। এস্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধুশব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দুই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত স্থানে দেখিয়াছি, যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই, যদি আপনার সন্দেহ থাকে ত ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়তঃ, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব-অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ

পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ "হ"য়ে এবং "ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্য্যয় নিয়ম-বিরুদ্ধ হয় নাই।

নিবেদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা।

জাতির অবস্থার সহিত ধর্ম্মের যোগ অনুভব করিতে হইলে একবার বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—বিশেষতঃ বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং যে সমস্ত গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণন কিম্বা পূজাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড শাসক—তাড়না করেন, লাঞ্ছনা করেন, গঞ্জনা দেন, অকথ্য বলেন এবং খেয়াল অনুসারে কুত্তা লেলাইয়া দিয়া তামাসা দেখেন। আমরা লাঞ্ছনা সহি, গঞ্জনা সহি, গালি খাই এবং কুত্তাকে বিষম ভয় করি। রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ্ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের একশেষ। ন্যায়ান্যায়-

.বাধ রাজদণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জ্জিই একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা।

যেমন রাজশাসন দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসন-তন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছে মাত্র। অপরিণত-বুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্ব্বনাশভয়ে দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্ব্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোড়াশোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।

দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগদ্বেষভয়হিংসা-বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায়। এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনও ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদ্‌শাহদেরই মত খামখেয়ালী মেজাজ—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট—কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয় বুঝা ভার। খেয়ালবশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয় তাহাকে ধন দেন রত্ন দেন, নবাবী প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইঁহাদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয় তাহার প্রতি তেমনি দুর্জ্জয় কোপ—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অনুগ্রহনিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাকে আমল দেওয়া চলে না। এবং সেটুকু কারণও অনেক সময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক

ঘটাইয়া থাকেন। হয় ত পুরাতন ভক্তে অরুচি জন্মিয়াছে, নূতন নহিলে মন উঠে না—অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কি করেন?—ভক্তের প্রতি এক দুঃসাধ্য হুকুম জারী করিলেন। ভক্ত বেচারী প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য আদেশ পালন করিয়া মরিল; কিন্তু দেবতার মায়া ত আর সে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহার মধ্যে গোপনে একটু ত্রুটি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাহির হইয়া আসিল—দুর্ব্বল ভক্ত-সন্তানের এতদিনের কায়মন ভক্তির চরম পুরস্কার!

এইরূপ খামখেয়ালী আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। কেবলি মানবের প্রতি নহে, ছোট দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারও এইরূপ। চণ্ডীর একবার সখ হইল, ইন্দ্রকুমার নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যে আপন পূজা প্রচার করিবেন। উপায় ঠাহরাইলেন, একটা কোন ছুতার অভিশাপ দিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিতে হইবে। ভগবতী শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিব মহা সঙ্কটে পড়িলেন। ইন্দ্র তাঁহার একজন একান্ত অনুগত সেবক, নীলাম্বর তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র, শিবপূজার জন্য স্বহস্তে ফুল তুলিয়া আনেন—বিশেষতঃ নীলাম্বরের শরীরে তিলমাত্র পাপ নাই; কোন্ ছুতায় শিব তাহাকে অভিশাপ দিবেন? ভগবতী পরামর্শ দিলেন—তাহার আর ভাবনা কি,

যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিবা কি দোষ তোমার॥

শিব অবিলম্বে সম্মত হইলেন। এখন কেবল নীলাম্বরের মহী ইচ্ছা করার অপেক্ষা।

ভগবতী মায়াপ্রভাবে একদিন নন্দনের সমস্ত ফুল হরণ করিয়া

রাখিয়াছেন। নীলাম্বর স্বর্গলোকে ফুল না পাইয়া পৃথিবীতে ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ব্যাধ ধর্ম্মকেতু এক রূপসী হরিণের পশ্চাতে তাড়া করিয়াছে—হরিণ আর কেহ নহে, স্বয়ং ভগবতী স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। নীলাম্বরের মন এই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ফুল হইতে বিচলিত হইল এবং তিনি মনে মনে বলিলেন যে, মালাকারের মত সাজি হাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ব্যাধের জীবন ঢের ভাল। ব্যাধজন্মের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যেটুকু বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে ফুলের সহিত একটি কণ্টক সংগ্রহ করিয়া আনায়, এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায়, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥

নীলাম্বর বা ইন্দ্র কেহই তাহা জানেন না। সুতরাং যখন

কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কণ্টক ফুঁকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥

মহাদেবের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ভীমমুখে তিনি ইন্দ্রকে যথেচ্ছা ভর্ৎসনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, ফুল আমি তুলি নাই, নীলাম্বর তুলিয়াছে। নীলাম্বরের কৈফিয়ৎ তলব হইল, কিন্তু সে কৈফিয়তে কোন ফল হইল না। চণ্ডীর পরামর্শ মহাদেব ভুলেন নাই। অভিশাপ বাহির হইল—

মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
ত্বরিতে চলহ মহী দিনু অভিশাপ॥

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মহাদেব টলিলেন না।

আর একবার চণ্ডীর সখ হইল, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে হইবে। পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিয়া তিনি ঠাহরাইলেন, ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন। রত্নমালার প্রতি হুকুম জারী হইল—হরের সভায় আসিয়া নৃত্য করিবে। রত্নমালা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সভা পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন, রত্নমালা তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা সকলেই নৃত্যে মুগ্ধ। কিন্তু চণ্ডীর ত নৃত্য দেখা উদ্দেশ্য নয়—রত্নমালাকে মর্ত্ত্যে পাঠাইতে হইবে, একটা কোন ছুতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়া চাহি। মদনকে দেবী টিপিয়া দিলেন, রত্নমালার প্রতি একটা বাণ হান। মদন সম্মোহন শর ছাড়িলেন। রত্নমালার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল এবং তাল ভঙ্গ হইল। চণ্ডী শাপ দিয়া বাঁচিলেন।

বিচার এবং বিবেচনা বঙ্গসাহিত্যের দেবতাদের নিকট কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। কেবলি একদল খেয়ালপরিচালিত কর্ত্তৃপক্ষ—যাহার প্রতি অনুকূল হয়েন তাহার সাত খুন মাফ এবং বিমুখ হইলে বিনা দোষেও উৎপীড়নপরাঙ্মুখ নহেন। কালকেতুর নগর বসাইতে হইবে—সেই জন্য চণ্ডী বিনা দোষে কলিঙ্গদেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রথমে ত কলিঙ্গনগরে গিয়া ঘরে ঘরে স্বপ্ন দিয়া আসিলেন যে, বীর কালকেতু যে নগর বসাইতেছেন তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর, অনেক ধনদৌলত মিলিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু স্বপ্ন সকলে শুনিল না। সুতরাং চণ্ডীকে

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি গঙ্গা সন্নিধানে চলিলেন।

সাধিতে আপন কাম আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা সম্মত হইলেন না। স্পষ্টই বলিলেন,

হইয়া বিষ্ণুর অংশা কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
মোরে পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অশ্রুমুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী গালি পাড়িলেন। বলিলেন, ভারি বৈষ্ণবী হইয়াছ দেখিতেছি, যত মকর কুম্ভীর পোষা হয়, আর কাজের সময় সাধ্বী সাজিয়া বসেন, একবার রকম দেখ গা! গঙ্গাও পাল্টা গালি দিতে ছাড়িলেন না। দুই পক্ষে ছড়া কাটাকাটি বেশ জমিয়া গেল। তখন পদ্মাবতী চণ্ডীকে সমুদ্রের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। ভগবতী, সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইল। ঝড়বৃষ্টিতে কলিঙ্গ হাজিয়া গেল। কলিঙ্গের প্রজা লইয়া কালকেতু স্বনগরে পত্তন করিলেন। বেচারা কলিঙ্গরাজের যে কি অপরাধ কেহ বুঝিতে পারিল না।

চণ্ডীর মহিমা সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ রহিল না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, জাগ্রত দেবতা এই বটে। নিত্য নূতন খেয়াল উঠে এবং অবিলম্বে খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ জবরদস্ত নহিলে দেবতা কিসের? কোন্দল করিতে হইবে—আচ্ছা তাই সহি; নৌকা-ডুবি করিতে হইবে—তথাস্তু; কাহাকেও কারারুদ্ধ করাইতে কপটাচরণ করিতে হইবে—বেশ কথা; দেবী কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। সারাদিন বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতীর সহিত কেবল ফন্দি আঁটিতেছেন—কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, কাহার পূজা লইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিপন্ন কিম্বা লুব্ধ ভক্তের সুদীর্ঘ চৌতিশা স্তবে এক একবার দেবীর মন বিচলিত হয়; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাকে? পদ্মাবতী গণনা করিয়া দেখেন—দেবী গতি করিয়া দেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর যেমন পদ্মাবতী ভারতচন্দ্রের অন্নদার সেই-রূপ জয়া। জয়ার সহিত পরামর্শ না আঁটিয়া অন্নদা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এবং জয়াকে তাঁহার অষ্টপ্রহরই আবশ্যক হয়। অন্নদা চণ্ডীরই বিভিন্ন সংস্করণ। খেয়ালের রকমসকমও চণ্ডীরই অনুরূপ। সখ হইয়াছে, পৃথিবীতে পূজা প্রচার করিতে হইবে; জয়ার পরামর্শানুসারে একটা ছল ধরিয়া কুবেরানুচর বসুন্ধরকে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্ত্যে গিয়া মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। বসুন্ধর দেবীর পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল। দেবী শুনিলেন না। বিষ্ণুহোড়ের গৃহে তাহার জন্ম হইল—নাম হইল হরিহোড়। দুঃখীর ছেলে হরিহোড় অল্পদিনেই বাড়িয়া উঠিল। বনে মাঠে ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই কায়ক্লেশে পিতামাতার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করে।

অন্নদা একদিন বুড়ী সাজিয়া সব ঘুঁটেগুলি একটি ঝুড়ী ভরিয়া রাখিলেন। হরিহোড় ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না। দেখিল, সব ঘুঁটে বুড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হরিহোড় ভাবিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বুড়ীর অনুগ্রহ হইল। সে হরি-হোড়কে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়ী হইয়াছি, এত ভার বহিতে পারি না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বহিয়া দাও আমি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে পারি। হরিহোড় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু হরিহোড়ের কুটীর অবধি আসিয়া বুড়ী আর চলিতে পারে না—সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিহোড় বলিল, আমরা আপনার অন্ন-সংস্থান করিতে পারি না, অতিথিসৎকার করিব কি দিয়া? তখন বুড়ী বলিল, সে জন্য ভাবনা নাই, অন্নপূর্ণার নাম লইয়া হাঁড়ী পাড় দেখি,

হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥

তাহাই ঘটিল। হরিহোড় তখন বুড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নদা পরিচয় দিবার পূর্ব্বে হরিহোড়ের হস্তে একখানি ঘুঁটে দিলেন। ঘুঁটেখানি হেমঘুঁটে হইল। হরিহোড় অবাক্। দেবী তখন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া হরিহোড়কে বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে এই দেহ বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

অন্নদা তথাস্তু বলিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিয়া

ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

অবশেষে উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধকালে হরিহোড়কে সোহাগা নাম্নী একটি রূপসীর সহিত গৌরী বিবাহ দিয়া দিলেন। হরিহোড়ের ঘরে সোহাগীর শুভাগমন পর্য্যন্ত নিত্য কোন্দল ঝগড়া আরম্ভ হইল। অন্নদা নিজে কোন্দলপটু হইলেও পরের কোন্দল সহিতে পারেন না। হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িবার পন্থা বাহির করিলেন। হরিহোড়

একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান ধরে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে।
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহর যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন, যে কয়টি দেবতা আছেন এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আপন

পূজা গণিয়া কাটান—কে মানিল না মানিল, কে ভক্তি করে, কে করে না, কে খুসী, কে নারাজ। চাল কলা নৈবেদ্য আর দুগোটা ছই প্রণাম পাইবার লোভে ইহাঁরা করিতে না পারেন হেন কাজ নাই। শুধু তাই নয়। এইগুলি না পাইলে বিষম ক্ষাপা। অদৃষ্টও তেমনি। এক একজন বিদ্রোহী জুটিয়া যায় তাহারা কিছুতেই বশ মানে না। মানব হইয়া দেবতাকে গালি পাড়ে, হেতাল হস্তে দেবতার মাথা লইবে বলিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে। দেবতা বেচারীকে হেতালের ভয়ে সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়—যে পাড়ায় হেতাল আছে তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিবার যো নাই। তাই বলিয়া দেবতার সহিত লোকে অবশ্য চিরদিন অাঁটিয়া উঠিতে পারে না—তাঁহাদের কত দুর্ভেদ্য ফন্দি আছে! নৌকা ডুবাইয়া না হয়, ছেলে ক'টাকে শিঙ্গা ফুঁকাইয়া দিবেন। তাহাতেও না হয়, সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। দুর্ব্বল মানবশিশুকে জব্দ করা বৈ ত নয়—একটা না একটা উপায় খাটিয়া যাইবেই।

চাঁদ সদাগরকে লইয়া মনসা দেবী কি না করিয়াছেন? সেও বশ মানিবে না—তিনিও ছাড়িবেন না। মনসার সহিত তাহার নিরন্তর ঝগড়া বাধে। এবং

দেবীর কোপেতে তার ছয়পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোড়ায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর॥

আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি॥

কিন্তু আপদ্ সহজে ঘুচে না। সদাগর সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে, মনসা সন্ধান পাইয়াছেন।

নেত লইয়া যুক্তি করে জয়বিষহরি।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।
বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি।
তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর। ইত্যাদি।

সদাগর সর্ব্বস্বান্ত হইল। তথাপি মনসার প্রতি তাহার বিদ্বেষ গেল না। মনসাও জুলুম করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ভিক্ষার উপরে সাধুর নির্ভর, গণেশের মূষিক ধার করিয়া আনিয়া তিনি তাহার ভিক্ষার অন্ন খাওয়াইয়া দেন। নিজের বাড়ীতে গিয়া চাঁদবেণে মনসার অনুগ্রহে ঠেঙ্গা খাইয়া মরে। মনসা গণকের বেশ ধরিয়া সাধুর স্ত্রীকে মিছামিছি বলিয়া আসিয়াছেন যে, আজ তোমার বাড়ী চুরী হইবে, সন্ধ্যার পর কলাবনে আসিয়া চোর অপেক্ষা করিবে, সেই সময় তাহাকে ধরিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিয়ো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সদাগর আসিয়া উপস্থিত—পরিধানে ছেঁড়া টেনা—সুতরাং লজ্জায় বেচারী আলো থাকিতে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। সনকা বেণেনী যথাসময়ে আসিয়া মনসার কথামত ব্যবস্থা করিল—সদাগরের পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিল। এই শেষ নহে। বেণেকে প্রতিপদে মনসা জালাতন করিয়া মারিয়াছেন। অনেক দিনের পর সদাগরের একটি পুত্র জন্মিল—নখীন্দর। সদাগর বেহুলা বলিয়া একটি রূপসী পাত্রী স্থির করিয়া তাহারই সহিত নখীন্দরের বিবাহ দিলেন। মনসার কোপে বাসরেই নখীন্দরের মৃত্যু হইল।

কিন্তু সদাগর বুলি ছাড়িল না। অবশেষে বহুদিন পরে বেহুলার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং ধনরত্ন সমুদয় ফিরাইয়া দিলেন। তখন চাঁদ বেণে মনসার পূজা করিল।

বেহুলার সেবার একটু বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবলোকের আরও কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবলোক যতটুকু দেখা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে পৃথিবীর কোন দৌরাত্ম্যেরই অভাব নাই—গালাগালি মারামারি হিংসাদ্বেষ অত্যাচার অবিচার বিভ্রমবিলাস সকলই ষোল-আনা আছে, অধিকন্তু সেখানকার ঋষিরাও নাচের মজ্‌লিসে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। মনসার ভাসানে দেবতাদের ঘরের খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেবতারা কি কাপড় পরেন, তাঁহাদের ধোপানী কে, সে কি দিয়া কাপড় কাচে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেহুলা ত এই ধোপানীর সাহায্যেই কার্য্য উদ্ধার করে। নেত ধোপানীকে সে মাসী বলিয়া ডাকে, দেবতাদের কাপড় দু'এক-খানা কাচিয়া দেয়, এমনি করিয়া ভাবসাব করিয়া থাকে। ধোপানী বেহুলার কাচা খান দুই কাপড় লইয়া গিয়া একদিন দেবসভায় উপস্থিত। সেদিন কিছু পরিষ্কার কাচা হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁগা বাছা, তুমি এত-দিন কাপড় কাচিয়া আসিতেছ এমন সুন্দর ত কোনও দিন হয় নাই—আজ হইল কিরূপে? নেত বলিল, আমার বোনঝি আসিয়াছে, এ কয়খান কাপড় সেই কাচিয়াছে। তখন

> মহেশ বলেন নাহি দেখি এতদিন।
> তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন॥
> দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন।
> ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

পরে বেহুলাকে সে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় লইয়া গেল। সেখানে বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। এখন মনসাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হয়। নেত ধোপানী মনসার প্রিয়সখী—অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া মনসাকে দেবসভায় লইয়া আসিল। দেবতারা পাঁচজনে বেহুলার হইয়া ওকালতী করিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর ফল ফলিল। কিন্তু মনসার তরফে ইনাইয়া বিনাইয়া ন্যাকামি করিবার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই বলা বাহুল্য। একে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, তাহাতে আবার নারী!

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড় কর্ত্তাটির অপকীর্ত্তি ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত 'খেলো' অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ—যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন। নেত ধোপানীর সহিত 'ইয়ারকি' দিতে হইলে সম্ভ্রম বজায় রাখা বোধ করি কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। চরিত্রের বল থাকে না। অন্নদামঙ্গলের শিব মদনের একবাণে একেবারে দিখিদিক্-জ্ঞানশূন্য। মদনকে ভস্ম করিয়াছেন নিতান্তই যেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরোধে।

ভাগ্যে ভাগ্যে নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নারদ গৌরীর সন্ধান দিলেন।

> শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
> ঘটক হও তাহার।

নারদ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।

"বাবা" সেদিন চলিলেন না—তাঁহার ত আর দায় নয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিবাহের সব স্থিরস্থার হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার—হুলাহুলির ধুম। এদিকে বাঘছাল খসিয়া পড়ে—শিবের হোষ নাই। মেনকা নারদের উদ্দেশে গাল পাড়িতে সুরু করিলেন,

হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়।
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্র ভরসা দিয়াছেন—

কোন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক।

যাহা হোক, বিবাহ করিয়া শিব গৌরীকে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধিঘোটনের ধুম পড়িয়া গেল। তাহার পর হরগৌরীর কথোপকথন। শঙ্কর দেবীকে বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

গৌরী পুরুষজাতির একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বলিলেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবতাদের এই অবস্থা! পুরুষ মহলে ভাঙটুকু ধুতুরাটুকু খাওয়া আছে, মজলিসে নাচটা আশটা দেওয়া আছে, এবং আনুষঙ্গিক দোষেরও ত্রুটি নাই; স্ত্রীমহলে ঝগড়া কোন্দল—এখানকার প্রথিতনামা পাড়াকোন্দলীরাও তাহার নিকট হার মানেন।

দেবলোকে সবই আছে—নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগস্বীকার, কোনরূপ উচ্চ আদর্শ। না থাকিবারই কথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণে আমাদের সমস্ত হৃদয় তখন জোড়া—উচ্চ আদর্শ ঠাঁই পাইবে কোথায়? রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র শিথিল—কেবলি রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এবং সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ। সামাজিক আদর্শও এই শাসন-নীতিরই প্রভাবে গঠিত।

এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি। বিচিত্র বিভিন্ন শক্তি এক বৃহৎ শক্তিতে নিমগ্ন এবং এক মূল শক্তি সহস্র বিরোধী শক্তিকে নিয়ত নিয়মিত করিতেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজতন্ত্রও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। উপধর্ম্ম এবং উপদেবতার প্রভাব প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

স্যর লেপেল্ গ্রিফিন্।

কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোন-

প্রকার গাম্ভীর্য্য অথবা গৌরব নাই—কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কথনো শুনা যায় নাই। সার্ লেপেল্ গ্রিফিন জুন মাসের ফর্ট্নাইট্লি রিভিয়ু পত্রে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হৌক্, বাঙ্গালীদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোন ফল না হউক্ আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট্ করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কন্গ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানা কারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজে দেখে। এজন্য গ্রিফিন্ সাহেব ধন্য।

তিনি আরো ধন্য যে, তিনি কোন যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপক্কতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্ব্বল

ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি জিনিষটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্ব্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। গ্রিফিন্ যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙ্গালীর কোন স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙ্গালী জিলাশাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙ্গালী মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোন অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূল তত্ত্ব গড়া যায় কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরাজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোন কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে

একটা সংযত আত্মমর্য্যাদা থাকে; কারণ, যে লোক সৌভাগ্যবান্ এবং ক্ষমতাবান্ তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মত যাহারা দুর্ভাগা, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরাজি বড় কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন্ বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্ব্বে নিজেদের পার্লামেণ্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরাজ মন্ত্রীসভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে—এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন।

ভারতবর্ষের কৃষক প্রজাদিগের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ তদন্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট সম্প্রতি একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গত মে মাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় রাজ উদয় প্রতাপ সিং এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন এবং উকীল মহাজন প্রভৃতি "হঠাৎ জমিদার"দিগের দ্রুত উত্থানই

যে প্রজাদিগের এই দারিদ্র্যের মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই হঠাৎ জমিদারেরা বারোমাস সহরে বাস করেন। নিজ প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কেবল অত্যাচার এবং অবিচারে ইঁহারা সবিশেষ পটু। সুতরাং ফল যে এইরূপ শোচনীয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এখন গবর্মেণ্ট যদি বুনিয়াদী জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে আশা করা যায়।

গবর্মেণ্ট যতদিন রীতিমত খাজনা পান, ততদিন জমিদারেরা যে শ্রেণীর লোক হোক না কেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। লেখক বলেন, এই মতটি সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের দেশে জমিদারেরাই যখন গবর্মেণ্ট এবং প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে, তখন উকীল মহাজন প্রভৃতি দ্বারা কি এই সম্বন্ধ সুরক্ষিত হইতে পারে! যাহাদিগের অর্থলিপ্সা রাজভক্তি অপেক্ষা বলবতী এবং প্রজাদিগের সহিত যাহাদিগের কেবল স্বার্থসম্বন্ধ, কোন বিচক্ষণ গবর্মেণ্টও কি তাহাদিগের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে! যাহাদিগের যুগপ্রবাহিত কুলমর্য্যাদা আছে এবং যাহারা প্রাণ অপেক্ষা মানকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করে কেবল তাহাদেরই দ্বারা নিমকহারামী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উদাহরণস্বরূপে লেখক বলরামপুরের মহারাজা এবং রাজা দেবীবক্স সিংএর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন ব্রিটিশ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তখন ইঁহাদের মধ্যে একজন নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কতক-

গুলি ইংরাজ বন্ধুকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অপরজন বিপন্ন গবর্মেণ্টের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিয়া তবে নিজে বিদ্রোহে যোগ দান করেন। লেখক বলেন, বংশানুক্রমে বীজ সঞ্চিত হইয়া তবে এইরূপ মহত্বের সৃষ্টি হয়।

সম্রান্ত প্রাচীন বংশের প্রতি সাধারণের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে লর্ড ক্যানিংএর মন্তব্য তুলিয়া লেখক তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। লর্ড ক্যানিং বলেন, অযোধ্যায় যখন বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন, পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া সমগ্র প্রজামণ্ডলী তালুকদারের আদেশে গবর্মেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। প্রজারা জমিদারকেই যে প্রকৃত রাজা বলিয়া সম্মান করে এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সম্মতিআইন পাশ হইবার সময় এবং রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকালে ইতর সাধারণের উপর উচ্চকুলের যে জয়লাভ হয় লেখক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন প্রকাশ্য আন্দোলন উঠিবার বহুপূর্ব্বে গবর্মেণ্ট উচ্চকুলোদ্ভব জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।

এই উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে লেখক তাহারও তিনটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) এইরূপ আইন গঠন করা যাহাতে জমিদারেরা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা অর্থ কর্জ্জ লইবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে না পারে।

(২) যে সকল জমিদার প্রাইমোজেনিচার অর্থাৎ অগ্রজই বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী এইরূপ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী তাহাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা।

(৩) যাহাতে ঋণগ্রস্ত জমিদারেরা সুব্যবস্থার জন্য সম্পত্তি গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারে তাহার সুবিধা করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, ইংরাজি আইনে যাহাকে এণ্টেল-স্বত্ব (দানবিক্রয়-ক্ষমতাশূন্য হইয়া পুরুষানুক্রমে কেবল উপভোগ-স্বত্ব) বলে, ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক না হইলেও পরিবর্ত্তিতাকারে ভারতবর্ষের পক্ষে যে ইহা ঠিক উপযোগী হইবে তাহার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ডে জমিদারেরা ভূসম্পত্তির উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে। আমাদের দেশের জমিদারেরা কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মণভোজন, শ্রাদ্ধ বাইনাচ প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষুধিত মহাজনের উদরপূরণ করে। আইন দ্বারা এই অনিষ্ট দূর করা ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই।

এণ্টেল স্বত্ব আমাদের দেশে যে সম্পূর্ণ নূতন নহে লেখক তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। রাজপুতানায় এই প্রকারের স্বত্ব কতকটা প্রচলিত আছে এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক বিষয়ে পিতাপুত্রের সমকালীন স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ পুত্রের অমতে পিতা সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে ইহাতে প্রচলিত হিন্দুপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যেখানে প্রচলিত প্রথা দেশের উন্নতি এবং সংস্কারের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে গবর্মেণ্ট এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে অযোধ্যার এক শ্রেণীর তালুকদার ইচ্ছা করিলেই প্রাইমোজেনিচার আইন অনুসারে

কার্য্য করিতে পারে। এখন এই অধিকার আর একটু বিস্তৃত করা, কথা এই বৈ ত নয়।

তৃতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, সম্পত্তির ব্যবস্থাভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্মেণ্টের এখনও আছে, কিন্তু এই ক্ষমতা যাহাতে যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে না পারে সেই জন্য আইনবন্ধন আবশ্যক।

প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে বুদ্ধিমান এবং মূর্খ দুই দল লোক থাকে। মূর্খের দমন করিতে গিয়া আইন দ্বারা বুদ্ধিমানের উন্নতির পথ বন্ধ রাখা গবর্মেণ্টের পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইবে সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

লেখক উকীল এবং মহাজনদিগের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের নিকটে ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। বুনিয়াদী জমিদারদিগের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ইঁহারা সকলেই যে রাজভক্তি এবং মহত্ত্বের এক একটি মূর্ত্তিমান আদর্শ এবং হঠাৎ জমিদারেরা সকলেই যে এক একটি আত্মসম্মান-বিবর্জ্জিত রাজদ্রোহী সেটা লেখকের কল্পনামাত্র।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ। লয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। প্রাইভেট্ টিউটার। পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোট গল্প।

গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয়, একটা দুটা আত্মহত্যা, নয়, সমাজ-বিদ্রোহ, নয়, কোন রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক্, লেখক এমত ভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁদা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণতঃ নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক—একদিকে হৃদয়ের টান, আর একদিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর—একটুখানি উপন্যাসের ধরণে প্রেমচর্চ্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা সখ মাত্র, কিন্তু শামলা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত সখের নহে, ঐটেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোন রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরাণী নহে, সে উপন্যাসের নায়ক—কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব। বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ়। কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যাক্তি বং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে—তাহার প্রধান কারণ

খবর আমরা পাইনা, খাঁটিখবর আমরা চাইওনা—মনে করি, খুব অলঙ্কার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোন একটা আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপুত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেই জন্য আসল কথাটা ভাল করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনী গাহিতে, বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্র বাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। "সমুদ্র-যাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা" প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

প্রশ্ন।

৬। কি কারণবশতঃ যোগবিয়োগগুণভাগে আমরা অযুগ্ম সংখ্যা অপেক্ষা যুগ্ম সংখ্যা করিতে পারি? যুগ্ম সংখ্যার যোগবিয়োগ গুণভাগ অযুগ্ম সংখ্যার অপেক্ষা আমাদের সহজে মনে থাকেই বা কেন? আটে আটে ষোল, ইহা আমাদের মনে রাখিতে যত অল্প কষ্ট হয় সাতে নয়ে ষোল মনে রাখিতে তেমন হয় না কেন?

পাঠক। বীরভূম

সাধনা।

স্বর্ণমৃগ।

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিকের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবন-সমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার এক পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল

কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না। পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডিমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলমকাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠির প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবর্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসু-

বিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষ-জাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিত্রাণ নহে। এক এক-দিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও!" বৈদ্য-নাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা—বন্ধ করিলে কি চলিবে?—ছেলেরা খাইবে কি?" গৃহিণী উত্তর করিতেন "আমানি।" আবার কোনদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন "আমি জানি না। কি করিতে হয় তুমি কর।" বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন "কি করিতে হইবে?" স্ত্রী বলিতেন "এমাসের মত বাজার করিয়া আন।" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত। বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন "এত কি আবশ্যক আছে?" উত্তর শুনিতেন "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব শস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরী

করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই। একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।" সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে

লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল। ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রুক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল; দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল "কাল সোনার রং ধরিবে।" সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই— পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই। সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহ-প্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়। মোক্ষদা এম্‌নি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই। অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কি আনিয়াছি বল দেখি!" স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!" বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট্‌ষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন। গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন "আ মরে' যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ

বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবা-বস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণপ্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানু-

ষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে!" কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল; টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল। মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কোন্মুখ ধান্যক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছে!"—ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা

হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিস্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে ছুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।" অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা!" ছোটটিও মনে করিল বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা!" বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন। অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!" বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদগতি করিবার যুক্তি করিতেছেন। পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে। বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কাশী যাইতে পারিব না।" বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিত পটুত্ব"

আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল। ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন। দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতের নির্ম্মাণ! ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন। বড় ছেলেটি বাপের

মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের তাণ-মাত্র করিয়া কহিল "বাবা; আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁমার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাও-য়াই যায় না। বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করি-লেন। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে। বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিত-হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয়

এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না। রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল। বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝে-ময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেজে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল। বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসি-
লেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও
প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত
ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে
ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে
ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন। দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া
গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌
এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল। ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের
কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতিউচ্চ কক্ষের
মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ
কিছু দেখিতে পাইলেন না। একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন
জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া
সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে
এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এই জন্য বাতি জ্বালাইতে
হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া
অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ
তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত কি
কারণে প্রবল হয় এবং শিকলি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ
করিতে থাকে। বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করিতে
করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া
দেখিলেন কলসী শূন্য। তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে
পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি
দিলেন ভিতরে কিছুই নাই—উপুড় করিয়া ধরিলেন কিছুই

পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বদ্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না। দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবতঃ এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া"মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিঃশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন। জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল। আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান। কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলের ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন। শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?" বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে

শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল "বাবা!" তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশীগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথকে দেখিতে পাইল না।

পরশ-পাথর।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা, ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে।

নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাথে ছাই ধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোণারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার!
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশপাথর!

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোণার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ;
মিলি' যত সুরাসুর কৌতুহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ;
বহুকাল স্তব্ধ থাকি' শুনেছিল মুদে' আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তার পরে কৌতুহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশপাথর !

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা !
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত !

যত করে হায় হায়, কোনকালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর!
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকিও দেখি!
সোণার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোণা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন!
কপালে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর!

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোণার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোণার স্বপন।

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে' হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ!
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ পুনঃ করিতেছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর!

লোক-চেনা।

প্রকৃতি-লক্ষণ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে অবিমিশ্র প্রকৃতি-ত্রয়ের লক্ষণ বর্ণনা করা গিয়াছে। আর একবার উহা সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক। বলময়ী অর্থাৎ অস্থিপেশীময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—বলবতী ইচ্ছা-শক্তি; স্থির বিবেচনাশক্তি; অক্লান্ত উদ্যম; অসীম সাহস; অবিরতচেষ্ট সঙ্কল্প; দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বলালসা; অবিচলিত আত্ম-নির্ভর। প্রাণময়ী অর্থাৎ দৈহিক পুষ্টি সাধনোপযোগিনী প্রকৃতির লক্ষণ—দৈহিক স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, আবেগ-বশবর্ত্তিতা, উৎসাহ, আগ্রহ, সুখ-লালসা, বৈচিত্র্যানুরাগ, আরাম-বাসনা,

ভোগলালসা, দ্রুত ও চটকদার বুদ্ধি, উদ্দেশ্যের অস্থিরতা, সৌম্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। মনোময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—জ্ঞানস্পৃহা, মনস্বিতা, সুরুচি, ভব্যতা, উচ্চস্পৃহা, উন্নত কল্পনা, তীব্র অনুভাব, সাহিত্য শিল্পানুরাগ ইত্যাদি। এই তিন প্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্যই পূর্ণাবয়ব চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। প্রায়ই দেখা যায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রে দুইটি প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রবল, অপরটি ক্ষীণতর। আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুসারে এই মিশ্র প্রকৃতিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি।
২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।
৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।
৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি।
৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি।
৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি।

এই মিশ্র প্রকৃতির নামকরণ দেখিলেই বুঝা যায় উহার প্রত্যেকটিতে কোন্ ধাতুর বিশেষ প্রভাব। অপেক্ষাকৃত যাহার অধিক প্রভাব তাহাকেই প্রথম আসন দেওয়া হয়। যথা, যে স্থলে প্রাণ অপেক্ষা বলের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য, সে স্থলে বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি বলা যায় এবং যে স্থলে বল অপেক্ষা প্রাণের প্রাধান্য সে স্থলে প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি বলা যায়।

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি। পাশব বলের পক্ষে এই প্রকৃতি অতীব উপযোগী। অস্থি-পেশী বেশ পরিপুষ্ট; স্কন্ধদেশ চওড়া; বক্ষদেশ প্রশস্ত; জীবনীশক্তি যথেষ্ট; দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অবিচলিততার সহিত কর্ম্মশীলতা জড়িত। এই প্রকৃতিতে

একটু আনাড়িপনা থাকিতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, কঠোর শ্রমশীলতা এই প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা বুদ্ধি বিদ্যার পক্ষে তেমন উপযোগী নহে—শিল্প-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকদিগের সহজ বিষয়বুদ্ধি সতেজ—বিষয়কর্ম্মে তাহারা বেশ স্থিরবুদ্ধি। অনেক সচ্চরিত্র লোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়—আবার অনেক বদ্‌মাইশ অপরাধীও এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। উচ্চ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে, এই প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করে। রাগ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপুসকল প্রবল হইয়া এই প্রকৃতিকে কুৎসিৎ করিয়া তোলে। লড়াক্কা পালোয়ান, খালাসী, সেপাহি, কৃষক প্রভৃতি—মুক্তবায়ুতে যাহা-দিগের দৈহিক শ্রম করিতে হয়—প্রায় তাহাদিগেরই মধ্যে এইরূপ প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।—যে প্রকৃতিতে বলের ভাগ বেশি, মনের ভাগ তার নীচে এবং প্রাণের ভাগ সকলের নীচে। এই মিশ্রণফলে বুদ্ধিশক্তি এবং তাহার সহিত দৈহিক বল, কঠোরতা ও সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি অপেক্ষা দেহ যদিও কিছু সরু—কিন্তু পেশী অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় এবং এই প্রকৃতির লোক অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্যমশীল হইয়া থাকে। উহারা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়, দ্রুতভাবে ও উদ্যমসহকারে পদ-চারণ করে এবং উহাদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সবল। এই-প্রকার মিশ্র প্রকৃতির লোকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশীল, কার্য্যে সাহসী, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী। ইহাদের দুর্দ্দান্ত রিপু-সকলও কতকটা উচ্চ ধর্ম্মবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-বৃত্তির অধীনে থাকে। গভীর বিদ্যা, অকপট কার্য্যোৎসাহ, ব্যবহারিক বিষয়-বুদ্ধি

উচ্চাভিলাষ, কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভের বাসনা, এই সকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যোদ্ধা, নবদেশানুসন্ধায়ী, যন্ত্রশিল্পী—জাহাজনেতা নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। ইহারা চিন্তাশীল ও কাজের লোক উভয়ই।

৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।—বৃহৎ চওড়া শরীর, স্কন্ধ প্রশস্ত, ঘাড় মোটা, পেশী-বহুল দেহ, সবল অস্থি-সন্ধি—কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সুগোল—এবং মুখাবয়বসকল বহিরুন্মুখ ও আশু-পরিলক্ষ্য; মুখের ভাব একটু কর্কশ; পদচারণ সজোর ও দ্রুত—কিন্তু সে চলা-ফেরার শ্রীর অভাব।—এই সমস্ত প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতির লক্ষণ। যাহাদিগের এইরূপ প্রকৃতি তাহারা কঠিন শ্রমে কাতর নহে, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও অঙ্গ-চালনা করিতে ভালবাসে এবং তাহারা কোনপ্রকার আটক বা বন্ধন সহ্য করিতে পারে না। প্রাণ-ধাতুর প্রাধান্যবশতঃ তাহারা বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও আবেগ-বশবর্ত্তী; কিন্তু অস্থি-পেশীতন্ত্রেরও কতকটা প্রভাব থাকায়, তাহারা মনের উচ্ছ্বা-সকে একটু সংযত করিয়া রাখিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা চটুল কিম্বা চটক্‌দার হয় না; ইহারা কাজের লোক; সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। ইহাদের বেশ সহজ বুদ্ধি; কাজকর্ম্ম বেশ চালাইতে পারে; ইহারা সফরী-ফর্ফর-বৎ ভাসা-ভাসা নানা বিদ্যার অধিকারী হয় না। উচ্চ ধর্ম্ম-বৃত্তির বল না থাকিলে, ইহাদের প্রচণ্ড রিপুবেগ ইহাদিগকে সহজেই বিপথে লইয়া যাইতে পারে।

৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি। এই মিশ্রণের ফল;—মোটা-সোটা সুগোল গঠন; মুখ বড় ও পরিপুষ্ট; মুখাবয়ব সুশ্রী, বেশি বহিরুন্মুখ নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্টরেখাঙ্কিত ও সমবিন্যস্ত।

অনেক স্ত্রীলোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। স্ত্রী-উপযোগী অনেক বাঞ্ছনীয় মনোরঞ্জন গুণ এই প্রকৃতিতে বর্ত্তে। যথা, স্নেহ মমতা, দয়া, ভালবাসা, সৌম্যতা, প্রফুল্লতা এবং তাহার সঙ্গে দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য। এই প্রকৃতি কতকটা আমোদ-প্রিয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে কতকটা ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই প্রকৃতির পুরুষেরা বাহিরের কাজের উপযোগী। ভাল শিক্ষা পাইলে, ইহারা উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারে; ইহারা কোন সার-গর্ভ বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না; গভীর চিন্তা কিম্বা কোন বিষয়ে তন্নতন্ন অনুসন্ধান ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইহারা একটু চটুল ও চটক্‌দার; ইহাদের নূতনত্ব কিম্বা উদ্ভাবনী বুদ্ধি তেমন নাই। ইহাদের লেখা ও বক্তৃতা বেশ অনর্গল-প্রবাহী, প্রায়ই অলঙ্কারপূর্ণ এবং কখন কখন অতিপ্রাচুর্য্যদোষে দূষিত। ইহারা দ্রুতগামী, চলাফেরায় শ্রীবিশিষ্ট এবং কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতির লোকে একটু লম্বা ও ঈষৎ পাতলা ধরণের; অবয়ব-রেখা একটু কোণবিশিষ্ট—একটু খোঁচ্‌বিশিষ্ট; কিন্তু ইহাদের আকার-প্রকার বেশ সম্ভ্রান্ত ও দৃষ্টি-আকর্ষক; ইহাদের দাঁড়াইবার ভাবে বেশ একটু ঋজুতা আছে; মুখাবয়ব সকল একটু বহির্ম্মুখ কিন্তু পাথরে খোদা মূর্ত্তির ন্যায় বেশ স্পষ্ট রেখাবিশিষ্ট ও চাঁচা-ছোলা; মুখের ভাব গম্ভীর; কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, উচ্চ-গ্রাম-স্পর্শী ও সুনম্য; চলাফেরা বেশ দৃঢ় ও স্থিরলক্ষ্যানুবর্ত্তী। এই মন ও বল-ধাতুর সহিত কতকটা প্রাণ-ধাতুর সংযোগ হইলে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হয়। যাহাদের এইপ্রকার প্রকৃতি তাহাদের বুদ্ধিশক্তির সহিত

কার্য্যক্ষমতা জড়িত। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি কাজ-কর্ম্ম, যে-কোন বিষয়ে তাহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও সফলতা লাভ করিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা গম্ভীর ও সারাল ধরণের সাহিত্যের অনুরাগী, বিজ্ঞানের ভক্ত; এইপ্রকার প্রকৃতি গ্রন্থকার হইবার পক্ষে উপযোগী। অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার এই প্রকৃতির লোক। ইঁহাদের লেখায় ধর্ম্মনীতির একটা অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত থাকে—ইহাঁদের পাশব-প্রবৃত্তিসমূহ স্বভাবতই ক্ষীণ এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীন।

৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতিটিও অতিশয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকেরা যতটা উন্নতমনা, প্রিয়দর্শন ও চটক্‌দার, ততটা সারাল, জোরাল, দৃঢ়সঙ্কল্প কিম্বা অবিরতচেষ্ট নহে। ইহাদের দেহ ঈষৎ খর্ব্ব; দেহ ও মুখ মাঝামাঝি পরিপুষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুডোল ও ক্রম-সংকীর্ণ। মুখাবয়ব তেমন বহিরুন্মুখ ও আশু-পরিলক্ষ্য নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট-রেখা-বিশিষ্ট এবং সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও সুন্দর। মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা, মধুরতা ও সহৃদয়তা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। চঞ্চল মস্তিষ্ক, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, সাহিত্য ও সৌখীন শিল্পে অনুরাগ, প্রবল গার্হস্থ্য ও সামাজিক ভাব, সমুন্নত নীতি ও ধর্ম্মভাব, আত্যন্তিক সৌম্যতা, দয়া মমতা কোমলতা ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা—এইসকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে মন-বলময়ী-প্রকৃতিসুলভ ওজস্বিতা, দৃঢ়তা, উদ্যমশালতার অভাব লক্ষিত হয়। অনেক বক্তা, কবি, উপন্যাস-লেখক শিল্পীর মধ্যে এই প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় (যদিও তাহারা ঐ দলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে)। অনেক স্ত্রীলোকও এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, মন-বলময়ী ও মন-প্রাণময়ী এই দুই মিশ্র প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অধিকাংশ বড়লোক এই দুই প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সমঞ্জসীভূত প্রকৃতি। তবে, মন প্রাণ বল এই তিন ধাতুর মধ্যে কোন দুইটির প্রভাব যেন চরিত্র-বিশেষে অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্টরূপ লক্ষিত হয় এই মাত্র। কেন না, পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায়ই কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—একটু উনিশ বিশ হইয়াই থাকে। যেমন মনে কর, ব্রাইট্ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্। এই দুই জনেরই প্রকৃতিতে উল্লিখিত তিন ধাতুর প্রায়ই সমঞ্জসীভূত সমাবেশ আছে। তবে ব্রাইটের প্রকৃতিতে প্রাণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-প্রাণ-প্রকৃতির কোটায় ফেলা যায়, আর গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-বল-প্রকৃতির সামিলে আনা যায়। যাঁহারা এই দুই জনের প্রতিকৃতি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের প্রকৃতি-গত প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয়েরই প্রশস্ত ও উন্নত ললাট—কিন্তু ব্রাইটের প্রকৃতিতে পুষ্টিতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আধিক্য ও গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে অস্থিপেশী-তন্ত্রের আধিক্য। ইহাঁদের চরিত্র ও বক্তৃতাতেও এই প্রভেদ বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ব্রাইটের বক্তৃতা পড়িয়া দেখ, উহা বেশ প্রাঞ্জল, সুললিত, জলবত্তরল—উহাতে ঘরো কথার আধিক্য। এবং গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতার বাক্যসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল, গভীর ও ওজস্বী। ইহাতে একজনের হৃষ্টপুষ্ট মুখের আমেজ্ পাওয়া যায়—আর একজনের দৃঢ় কঠোর অস্থি-পেশীর আভাস উপলব্ধি হয়। ইহাঁদের বক্তৃতা দিবার ধরণেও এই

প্রভেদ অনুভব হয়। শুনিয়াছি ব্রাইট্ যখন বক্তৃতা করিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সহিত সহৃদয়-ভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন; কিন্তু গ্লাড্ষ্টোন্ যেন প্রতি কথা নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া সবলে বাহির করেন—এবং তাঁহার এক একটি ওজস্বী কথা যেন শ্রোতাদিগের মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ের মত আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া দৃঢ়তা, উদ্যম, শ্রমশীলতা, অবিরত-চেষ্টতা—যাহা বল-প্রকৃতির লক্ষণ, তাহা ব্রাইট্ অপেক্ষা গ্লাড্ষ্টোনে শতগুণ অধিক।

আমাদের দেশের দুই একটা ঘরো দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার এজ্‌লাসি কাজকর্ম্ম সত্ত্বেও যে এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিয়াছেন—তাহা কেবল অস্থি-পেশীতন্ত্রের প্রভাবে—যদি তাঁহার বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের প্রভাব বেশি হইত তাহা হইলে পারিয়া উঠিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের অক্ষয় বাবুর (অক্ষয়কুমার দত্ত) দৈহিক প্রকৃতিতে বল-ধাতুর অভাব থাকায়, তিনি গোটাকতক ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই অচিরাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লেখায় যে লালিত্য, সুন্দর বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার প্রাণময়ী প্রকৃতির গুণে বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতিগত প্রাণধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখায় ভাবের এত সরসতা—এবং তাঁহার প্রকৃতিগত বল-ধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখনীর এত প্রখরতা। এই জন্য তাঁহার লেখা "প্রখরে মধুরে" বেশ মিশিয়াছে। এই জন্য বঙ্কিম বাবুর লেখায় যুক্তির এত বাঁধুনি ও ফাল্‌ত বাজে-বকুনির অভাব। যাঁহাদের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের আধিক্য, অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা অপেক্ষা ললিত বাক্যবিন্যাসের দিকে তাঁহাদের অধিক টান।

তাঁহাদের লেখায় একটু শব্দবাহুল্যও হইয়া পড়ে। বাক্যকে সুশ্রাব্য করিবার জন্য হয়তো একই ভাব তাঁহারা ভিন্ন কথায় তিনবার করিয়া ব্যক্ত করিবেন। তাঁহাদের লেখায় যুক্তির ভাগ কম, উচ্ছ্বাসের ভাগ একটু অধিক। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যতটা গর্জ্জন ততটা বর্ষণ নহে—যতটা শব্দঘটা, ততটা সার নাই। আর এক দৃষ্টান্ত, আমাদের চন্দ্রনাথ বাবু। ইনি সুলেখক বটে, কিন্তু ইঁহার লেখায় যেন প্রাণ-ধাতুর অংশ একটু বেশি মাত্রায় আছে বলিয়া বোধ হয়—একটু যেন অস্থি-পেশীর অভাব। বঙ্কিম বাবুর মন-বলময়ী প্রকৃতি; চন্দ্রনাথ বাবুর মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহারা মন-বলময়ী প্রকৃতির জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত যত পাই ততই আশার সঞ্চার হয়। আমাদের সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কেও বোধ হয় এই কোটায় ফেলা যাইতে পারে—তাঁহারও শ্রমশীলতা ও উদ্যম য়ুরোপীয়-সুলভ।

আমাদের বঙ্গদেশে প্রাণ-ধাতুরই একটু বেশি প্রাদুর্ভাব! প্রাণ-ধাতু সম্পূর্ণাবয়ব হইলে মন্দ নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণের দুই উপাদান রস ও রক্তের মধ্যে রসাংশটই বাঙ্গালীর দৈহিক প্রকৃতিতে বেশি দেখা যায়—তাহাতে তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া আলস্য ও জড়তা উৎপন্ন হয়। যে দেশের জলবায়ু আর্দ্র সেই দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের প্রাণধাতুর আধিক্য ও বলধাতুর অভাব থাকায় আমরা সহজে হুজুকে মাতিয়া উঠি—বৈদেশিকদিগের টিট্‌কারি সহ্য করিতে না পারিয়া হয় আমাদের নিজস্ব সহজে ছাড়িয়া দিই—অথবা সমাজের ভয়ে জড়সড় হইয়া বাস্তবিক কোন অশুভ প্রথাও

পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। আমরা কোন বৃহদ্ব্যাপার সমাধা করিয়া তুলিতে পারি না—যাহাতে অবিরত চেষ্টা অবিশ্রান্ত শ্রমের প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি না। যে সকল কার্য্যে উপস্থিতমত বাহবা পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্য করিতেই আমরা ভালবাসি—আমরা খুব চটক্ লাগাইয়া দিতে পারি কিন্তু কোন সারবান্ স্থায়ী কার্য্য আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। অতএব মনোময়ী ও বলময়ী প্রকৃতির যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য—তাহার প্রধান উপায় জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা, উপযোগী আহার ও ব্যায়াম-চর্চ্চা। মন, বল, প্রাণ—আর এক কথায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাব—কিম্বা দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনের সামঞ্জস্য না হইলে মানব-চরিত্রের কথনই পূর্ণতা লাভ হয় না।

জাহাজের কাহিনী।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

১৪অক্টোবর। জিব্রল্টার পৌছন গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্চে।

আজ ডিনারটেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকীস্বরে বল্লেন—পাখাওয়ালারা রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বল্লে তার একমাত্র প্রতিবিধান হচ্চে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা

তপ্ত শূল বিঁধ্‌ল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশী দুর্ব্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে' দেবে তার আর বিচিত্র কি? আমিও ত সেই অপমানিত জাতের একটা লোক, আমি কোন্‌ লজ্জায় কোন্‌ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে' খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি!—শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথা বহুচেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না! বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরাজী ভাষাটা বড়ই বিজাতীয় রকমের ভাষা—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা আর কিছুতেই মনের মত কায়দা করে' উঠ্‌তে পারিনে—তখন মাথার চতুর্দ্দিক হতে রাজ্যের বাঙ্গলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মত মুখদ্বারে ভিড় করে' ছুটে আসে। ভাব্‌লুম এত উতলা হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরিজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগ্‌ড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভাল হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমত ভাবটা ইংরাজিতে রচনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

কথাটা ঠিক বটে মশায়! পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুল্‌লে অত্যন্ত অসুবিধে হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম খপ্‌ করে' তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি!

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল সেটা একটা

প্রাকৃতিক সত্য—সে আর আমাদের অস্বীকার করবার যো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান!

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্ব্বের বিষয়, যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হয়!

তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোন শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাক্‌তেও পারে। কিন্তু যখন একজন অস্থিজর্জ্জর অর্দ্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে' ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কি দেখা যাক্! ভোরের বেলা আহার করে' বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আরো দুটো পয়সা বেশি উপার্জ্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু'চার আনায় বিক্রয় করেচে। নিতান্ত গরীব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়সাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করেনি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বল্‌তেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মত বসে' বসে' পাখা টান্‌তে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আস্‌বেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রা[illegible]
পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি [illegible]

করে, কারণ, তখনি তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে' থাক যে, "তোমা-দের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোন স্বাধীন অধিকারপ্রাপ্তির যোগ্য নও।"

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে,—যে জাত নিরাপদ দেখে' দুর্ব্বলের কাছে "তেরিয়া"—অর্থাৎ তোমরা যাকে বল "বুলি"—যার কোন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোন বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু'রকমের আছে—ধর্ম্মতঃ এবং কার্য্যতঃ। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাক্‌লে অনেক কাজই বলপূর্ব্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিকগুণের দ্বারাই সে কার্য্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

তুমি কেবল প্রহারের জোরে পিতার কর্ত্তব্যসাধন করতে পার কিন্তু পিতৃস্নেহ এবং মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতীত ধর্ম্মতঃ পিতৃত্বের অধিকার জন্মে না।

কিন্তু ধর্ম্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না বলে' যে, ধর্ম্মের ...শ্য অরাজক তা' বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং ...র ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্চে, একসময় এরা ...দ্দবে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য করে' যাই, প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য অনেক ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়; যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সে অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না। যে সৌভাগ্যবানের দ্বারে অর্গল আছে চোরের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রতি তার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না—অর্গলটাই তার আশু উপকারে দেখে।

লাথির পরিবর্ত্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম্মভয় দেখান যদিচ দেখ্‌তে অতি মনোহর হয় বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্ত্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে মাত্র বল সঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোন!

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরাজ প্রভুর নিতান্ত

"পেটার্নাল্ ট্রীট্‌মেণ্ট্"-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইং-রাজের পিলে কিরকম অবস্থায় আছে এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তার কোন পরীক্ষাই হয় নি।

আমাদের ভারতবর্ষীয়দের বিশ্বাস, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকেরই পিলে এত অতিশয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যে বুটসমেত সজোর লাথি বেশ নিরাপদে সহ্য করতে পারে!

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্চে না; পিলে ফেটেযে আমাদের অপ-ঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যেরকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে' বলা হয় যে, তোমাদের আমরা মানুষ জ্ঞান করি না। তোমাদের দুটো চারটে যে থামকা আমাদের চরণ-তলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে তোমাদের পিলের দোষ! পিলে যদি ঠিক থাক্‌ত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাক্‌তে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার থাবার অবসর পেতে।

যা হোক্, ভদ্রনাম ধরে' অসহায়কে অপমান করতে যার সঙ্কোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্ব্বল হলেও তাকে যথন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে' থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পারিনে। ইংলণ্ডে ত তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি করে' নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইং-রাজের ঘর থেকে কি একটি মেয়েও আসেন না, যিনি উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে' মনোভার

কিঞ্চিৎ লাঘব করে' যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার। তিনি ত আমাদের মুরুব্বি ছিলেন না, যথার্থই পিতা ছিলেন। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, বিবাহ করেন, এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে' আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কি অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে' সৃজন করেন নি!——

যাই হোক্, স্বগত উক্তি যত ভালই হোক্ ষ্টেজ্ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ্ওয়ালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠ্‌ল চোর তখন পালিয়েচে—তারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েচে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগ্‌লুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগ্‌চে ভাল। অল্পবয়স, মন খুলে' কথা কয়, কারো সঙ্গে বড় মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট্ করে' বনে' গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলেন "They are not at all smart!" বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরাজমেয়ে দেখা যায় তারা বড়ই

smart—বড্ড চোকমুখের খেলা, বড্ড নাকেঁ মুখে কথা, বড্ড খর-তর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভাল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোট ছোট নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেম্‌নি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে' সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্‌ করে' একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল; হঠাৎ এই বাঙ্গলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। আমি দেখ্‌লুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মাণ্টা দ্বীপে পৌছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে' নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল।

সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠ্‌লুম। অনেকগুলি গাইড্-পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত না!—আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য কর্‌তে পারে না। এই জন্যে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, একজন ইংরাজভিক্ষুক এবং একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুক ঠিক এক শ্রেণীর নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির অগৌরব না থাকাতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা অবলম্বন করে তার আত্মসম্মান দূর হয় না। আমাদের দেশে মানুষের দয়া এবং দানের উপর মানুষের অধিকার আছে; দাতা এবং ভিক্ষুক, গৃহস্থ এবং অতিথির মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধন নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিক্ষার মধ্যে সেই হীনতা নেই। আমাদের মহাদেব ভিখারী। ইংলণ্ডে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুর উপরে নির্ভর করা হীনতা, সুতরাং ইংরাজ "বেগর" ঘৃণার পাত্র।

ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত

ইতিহাসপরম্পরা যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি তাহলেই আমরা পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!

'মাল্টা' সহরটা দেখে' মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠ্‌চে একবার নীচে নাম্‌চে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক্ আছে সেইখানে ব্যাণ্ড্ বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে' আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না—আমাদেরই দোষ! আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি বিষয়বুদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না। এরকম মুখশ্রী দেখ্‌লে অতি বড় সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক্ মাল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে' এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনারটেবিলে "স্মাগ্লিং" সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্ত্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেণ্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা যেন কিঞ্চিৎ গৌরবের বিষয় মনে করে। আর যাই হোক্, তেমন নিন্দা বা

লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এম্‌নি জীব! একজন ব্যারিষ্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পূরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সে জন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না—কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরাজী করে' বলেন "রাইটিয়াস্ ইণ্ডিগ্নেশন্!" সর্ব্বনাশ!—

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। এই বৃষ্টিতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে' দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে' রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে' দুটো খালিপা ইটালিয়ান্ ছোক্‌রা ফিগ্ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি না—আমরা বল্লুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্‌শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ চল্‌তে লাগ্‌ল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ

উচ্চ হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে' গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বাড়ি, জান্‌লার কাছে ফিগ্‌ফল শুকোতে দিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট শাখাপথ বক্রগতিতে এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের দেখ্‌লুম। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোট ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দ্দা দিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন্ জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলা-ঘর—এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষী আছে—মৃত্যুটাকে যেন গম্ভীরভাবে নেওয়া হচ্চে না।

গোরস্থানের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃ-ঙ্খল ভাবে স্তূপাকারে সাজানো রয়েচে। তৈমুরলঙ্গ বিশ্ববিজয় করে' একদিন এইরকম একটা উৎকট কৌতুকদৃশ্য দেখে-ছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে' বেড়াচ্চে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দ্দা ফেলে রেখেছে—কোন নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্ম্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহলে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে' বসে' শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে। পুরোণো বিষয়! পুরোণো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন করে' নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেচেন—কিন্তু অনেক-

ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে' আমার কিছুই ভয় হল না! শুধু এই মনে হল, গীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর— ঐ গোলাকার অস্থিবুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে! এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে' চীৎকার করে' মরচে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জ্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করচে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোন খোঁজ নিচ্চে না।

যাই হোক্, আপাততঃ আমার এই কপালফলকটার মধ্যে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করচে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে—ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্চি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেচে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাঙ্গলা দেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠ্‌ছে।

ডেকের উপরে বসে' গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখ্‌লুম, ছ'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে' নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্চে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিচ্ছুক উট্‌কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্ —কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো এ নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে ছুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই। আমি এর ইতিহাস কিছুমাত্র জানি নে—কিন্তু যে সব রমণী চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে উগ্র উত্তেজনায় জীবনের সমস্ত সহজ-সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীতস্পৃহ হয়েচে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই

উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে অতি সহজে স্ত্রী থেকে মা, এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে। পূর্ব্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেখ! কুমারীদ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে। আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই,—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর।

২৫ অক্টোবর।—আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে' দরজার সাম্নে অপেক্ষা করে' দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-পুঙ্গব অম্লানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে' ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে' মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লুম, নম্রতা গুণটা খুব ভাল হতে পারে কিন্তু খৃষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখ্‌তে অনেকটা ভীরুতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয় কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংস-বহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সঙ্কোচজনক মনে হল। স্বার্থপরতা অনেক সময় এই জন্যই জয়লাভ করে—বলিষ্ঠ বলে' নয়—অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিৎ বলে'!

মইনু।

১

তন্ময় হ'য়ে খেলিছে নীরবে
চারি বছরের মেয়ে!
মৃণ্ময় তার ছোট ঘরখানি
ধূলি শাক পাতা লয়ে!
মুগ্ধনয়নে সহোদর কাছে,
বসি সে নেহারে খেলা,
পিতা বসি দূরে, ভাবেতে মগন
মসী-সমরেতে ভোলা!

২

ধূলি অন্ন রাঁধি ডাকি সহোদরে
কহিছে মোহিনী মেয়ে,
"খেতে বোস দাদা, মিছামিছি করে'
জল আসি আমি নিয়ে!"
ক্ষুদ্র গাগরী ধরিয়া কাঁখেতে
আঙ্গিনার পানে ধায়,
শূন্যে পূরিয়া মিছার সলিল
হাসিয়া ফিরিয়া চায়!

৩

দূর যেন কোন বাঁশরীর তান
পিতার শ্রবণে পশে,
বিস্মৃত যেন স্বপনের স্মৃতি
মরমে ফিরিয়া আসে!

"কি বলিলি মাগো জানা আছে তোর
এসব মিছার খেলা,
জেনে শুনে মোরা, ভুলে থাকি যত
বহে' তত যায় বেলা!"

৪

আদরের ডাকে, মইনু হাসিয়ে
ঝাঁপিয়ে কোলেতে ধায়!
স্নেহরাগভরে, বদন চুমিয়ে,
জনক কহিছে তায়।
"মিছা খেলা তোর, মিছা সব যদি
হাসিও কি মিছা তোর!
কন্যারূপিণী জননী আমার,
প্রেমের কোমল ডোর!"

বুড়া ও বুড়ির কথা।

(জাপানের গল্প)

(আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটির "করুণা ও মরণের কথা" নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।)

টোটোসান ও কাকাসান স্বামী ও স্ত্রী। তাহারা অতি, অতি বৃদ্ধ; সকলেই তাহাদের চিরকাল জানিত; এমন কি, নাঙ্গাসাকির প্রাচীনতম অধিবাসীদেরও মনে পড়ে না যে, কখনো তাহাদের যৌবনকাল দেখিয়াছে।

তাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। কাকাসান পক্ষা-

ঘাতগ্রস্ত, টোটোসান অন্ধ; সে একখানি ছোট বাক্স-গাড়িতে তাহার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত।

পূর্ব্বে ইহাদের নাম ছিল হাটোসান ও উমেসান (শ্রীযুক্ত পায়রা ও শ্রীমতী পেয়ারা) কিন্তু সে নাম আর কাহারো মনে ছিল না।

নিপনী ভাষায় টোটো ও কাকা অতি মিষ্ট শব্দ, ছেলেদের মুখে তাহার অর্থ "বাবা ও মা।" তাহাদের বয়সের আধিক্যহেতু সম্ভবতঃ সকলে এই বলিয়া ডাকিত; এবং এই দেশের আত্যন্তিক ভদ্রতাবশতঃ এই দুই ডাক-নামের পর লোকে 'সান' শব্দ বসাইত, তাহার অর্থ সম্মানসূচক, যথা, মহাশয় বা ঠাকুরাণী (বাবামহাশয় ও মাঠাকুরাণী); জাপানী শিশুগণও শিষ্টতার এই সকল নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করে না।

তাহাদের ভিক্ষা করিবার প্রণালী ভদ্রোচিত ও সুসংযত; তাহারা কাতর অনুনয় দ্বারা লোকদের বিরক্ত করিত না, কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র হস্ত প্রসারণ করিত, সেই লোলচর্ম্ম হস্ত যেন ইহারই মধ্যে ইজিপ্টের সুরক্ষিত মৃতদেহের ন্যায় বলি-রেখাঙ্কিত। তাহারা ভিক্ষাস্বরূপ ভাত, মাছের মুড়া ও উচ্ছিষ্ট ঝোল পাইত।

সকল জাপানী মেয়ের ন্যায় কাকাসান নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি; বহুকাল এই বাক্স-গাড়িতে বসিয়া বসিয়া তাহার শুষ্ক অর্দ্ধমৃত দেহ যেন তাহাতে লীন হইয়া গিয়াছে।

তাহার গাড়িটি চাকার উপর ভালরূপ বসানো হয় নাই; সুতরাং সহর ভ্রমণকালে তাহাকে খুব ঝাঁকানি সহিতে হইত। তবু তাহার বৃদ্ধ স্বামী আস্তে আস্তে কত সাবধানে কত সন্তর্পণে চলিত। কাকাসানের কণ্ঠস্বর অনুসারে চালিত হইয়া টোটো-সান নিবিষ্টচিত্তে কর্ণপাত করিয়া তাহার চির-অন্ধকার পথ

অতিবাহিত করিত; সম্মুখস্থ পথ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার হস্তে বাঁশের লাঠি, স্কন্ধে গাড়ি টানিবার চর্ম্মখণ্ড।

সিঁড়িতে উঠিবার বা কোনরূপ নালানর্দ্দামা পার হইবার আবশ্যক হইলেই বড় গোল বাধিত, কিরূপে টোটোসান এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে? তখন বুড়ি বেচারীর দিকে চাহিয়া দেখ, বাক্সের ভিতরে বসিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কালের দৌরাত্ম্যে যদিও তাহার চক্ষু বাষ্পাবৃত তথাপি বিপদাশঙ্কায় তাহার সেই চক্ষু জ্বলিতেছে, তাহার মুখের ভাব ব্যাকুলতাপূর্ণ। এই পড়িবার ভয়ই যে তাহাকে শেষদশায় অধিকতর ক্ষীণ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

এই যে দুই বুড়াবুড়ি পরস্পরকে এত ভালবাসে, ইহাদের মস্তিষ্কমধ্যে না জানি কি ভাবের উদয় হয়? সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জনে বসিয়া দুইজনে কি গল্প করে? রাত্রিকালে যখন কাকাসান মাথায় তাহার নীল রুমাল বাঁধে ও দুইজনে ঘুমাইবার নিমিত্ত কোন আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহারা যৌবনের কোন্ স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলে? আগামী কল্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিরূপে তাহারা পরামর্শ করে—সেদিনও ত ঠিক গতকল্যেরই অনুরূপ হইবে, অন্নের জন্য সেই একই চেষ্টা, সেই ভগ্নদশা, সেই দুঃখকষ্ট। তাহাদের কি এখনও কোন সুখ, কোন আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে? তাহাদের কি আজিও চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান? কেন তবে তাহারা বাঁচিতে এত দৃঢ়সঙ্কল্প, যখন পৃথিবী তাহাদের গ্রহণ করিবার জন্য, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া এই জীবন্মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যুতে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত?

মন্দিরে সকল ধর্ম্মোৎসবের সময়ে টোটোসান ও কাকাসান উপস্থিত থাকিত।

মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণের বড় বড় কালো সিডার বৃক্ষের ছায়ায় কোন প্রাচীন বিকট প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে তাহারা সকাল সকাল গিয়া বসিয়া থাকিত,—তখনও ভক্তবৃন্দের কেহই আসে নাই। যতক্ষণ পূজা চলিত, অনেক যাত্রী আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইত। পুত্তলী-বদনা বিড়ালনয়না যুবতীগণ তাহাদের উঁচু কাঠের জুতা টানিয়া চলিয়াছে; নিপনী বালক-বালিকা অদ্ভুত বিবিধ বর্ণখচিত লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া, দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া পূজা করিতে আসিয়াছে; কেশবিন্যাসনিপুণা হাবভাবপরিপূর্ণা সুন্দরী রমণীগণ পূজা করিতে ও হাসিতে পাগোডাতে যাইতেছে; দীর্ঘকেশ কৃষক, বৌদ্ধ পুরোহিত বা বণিক, এই ক্ষুদ্রকায় আমোদপ্রিয় জাতির অন্তর্গত সকলপ্রকার পুত্তলিকা কাকাসানের সম্মুখ দিয়া যাইত; এখনো তাহার এ সকল দেখিবার শক্তি ছিল, টৌটোসানের সে শক্তি রহিত। সকলেই তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিত, কোন কোন দল হইতে একজন আসিয়া তাহাদের ভিক্ষা দিত; এমন কি অনেকে তাহাদের অভিবাদনও করিত, ঠিক যেন তাহারা খুব উচ্চশ্রেণীর লোক। এই রাজ্যের লোক এতই ভদ্র, এবং এই বৃদ্ধ দম্পতি এমনই সুপরিচিত।

এই সকল দিনে, যখন আকাশ পরিষ্কার ও বাতাস অনতি-শীতল থাকিত, যখন তাহাদের জরাজনিত যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইত, তখন তাহারাও উৎসবের হাসিতে যোগ দিত। কাকাসান চতুর্দ্দিকের আনন্দময় হাস্যধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া তাহার কাগজের পাখাখানি লইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীদের ন্যায় ভাবভঙ্গী করিত, এমন ভাব ধারণ করিত যেন এখনো তাহার জীবন উপভোগ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে,

যেন এখনো এই পৃথিবীর আমোদে তাহার আমোদ বোধ হয়।

কিন্তু যখন সন্ধ্যার আগমনে বৃক্ষতল অন্ধকার ও শীতল হইত, যখন সেই প্রস্তর-মূর্ত্তিশোভিত সঙ্কীর্ণ পথে ও মন্দিরের আশপাশে যেন সহসা একটা ভীষণ দৈবরহস্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন এই বৃদ্ধ স্বামীস্ত্রী নিতান্তই অবসন্ন বোধ করিত। দিবসের শ্রান্তি যেন তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করিয়াছে, তাহাদের বলিরেখা আরও গভীরাঙ্কিত, তাহাদের শুষ্ক চর্ম্ম অধিকতর লোল; তাহাদের মুখে কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং আসন্ন মৃত্যুর কাতরতা বিরাজমান।

তাহাদের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বৃক্ষশাখায় শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইল, এবং মন্দিরের সোপানোপরি উপাসকমণ্ডলী সমবেত হইতে লাগিল। একদিকে এই জনতার বিচিত্র ও চঞ্চল আমোদের গুন্‌গুন্ ধ্বনিতে মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও পবিত্র গম্বুজ পূর্ণ, অপরদিকে চিরহাস্যবিকশিত নিশ্চল দেবরক্ষক প্রস্তরমূর্ত্তি, ভীতিজনক ও অজানিত চিহ্নসকল এবং নিশীথের অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা। দীপালোকে উৎসব চলিতে লাগিল, তাহা যেন পূজা না হইয়া আকাশের দেবতাগণের প্রতি একটা প্রকাণ্ড উপহাসের ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু সে উপহাসে বিষ নাই, সে উপহাস সরল, উদার ও আনন্দপূর্ণ।

কিন্তু যাহাই হোক, একবার সূর্য্য অস্ত গেলে এই দুই মনুষ্যদেহাবশেষকে আর কিছুই সজীব করিয়া তুলিতে পারিত না; তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর দেখিতে হইত, জড়সড় হইয়া রুগ্ন কুকুর বা বৃদ্ধ জীর্ণ বানরের ন্যায় তাহারা একপার্শ্বে পড়িয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নকণা ভক্ষণ করিত। এই সময়ে তাহাদের মৃতপ্রায়

মুখে ওরূপ ব্যাকুল উদ্বিগ্ন ভাব কেন? তাহারা কি কোন গভীর অনন্ত তত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন?—কে বলিবে এই বৃদ্ধ মস্তকের অভ্যন্তরে কি হইতেছে? হয়ত কিছুই নহে! তাহারা কেবলমাত্র প্রাণধারণচেষ্টায় প্রাণপণ যুঝিত, তাহারা পরস্পরকে স্নেহসহকারে সাহায্য করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ভাতের কাঠি দিয়া খাইত; পাছে শীত করে, পাছে হিম লাগে, সেই ভয়ে তাহারা গায়ে কাপড় মুড়ি দিত; পরদিন যাহাতে জীবিত থাকিয়া একজন অপরকে টানিয়া সেই ভ্রমণে বাহির হইতে পারে, এই ইচ্ছায় তাহারা সাধ্যমত আপনার প্রতি যত্ন করিত।

সেই ক্ষুদ্র গাড়িটিতে, শুদ্ধ কাকাসান নহে, তাহাদের গৃহস্থালীর সকল দ্রব্যই থাকিত, ভাত রাখিবার কতকগুলি নীল কাঁচের ভাঙ্গা পিরীচ, কতকগুলি ছোট ছোট চায়ের পেয়ালা, এবং একটি লাল কাগজের লণ্ঠন, সেটি তাহারা সন্ধ্যাবেলায় জ্বালাইত।

সপ্তাহে একবার করিয়া অন্ধ টোটোসান যত্নপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর কেশরঞ্জন ও কবরীবন্ধন করিয়া দিত। জাপানী কেশবিন্যাসে যে পরিমাণে হস্তোত্তোলন আবশ্যক, তাহা কাকাসানের সাধ্যাতীত, সুতরাং টোটোসান শিখিয়া লইয়াছিল। কাকাসান অলসভাবে তাহার স্বামীর নিকট মস্তক সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, টোটোসান তাহা লইয়া কম্পিতহস্তে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া নাড়াচাড়া করিত, ইহা দেখিয়া বানরগণের যোড়ে যোড়ে পরস্পরকে সাজানো মনে পড়িয়া দুঃখ হইত। কাকাসানের চুল অতি অল্প, সেই হলুদবর্ণ কাগজসদৃশ, শীতকুঞ্চিত ফলের মত মস্তকে টোটোসান আঁচড়াইবার বড় বেশি কিছু

পাইত না। তবু সে কোনপ্রকারে অলকগুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া নিপনী রুচি অনুসারে সাজাইত; কাকাসান আগ্রহসহকারে একটি আরসীতে এই সজ্জার পরিণাম নিরীক্ষণ করিত, "আর একটু উঁচু হইবে, টোটোসান! আর একটু ডানদিকে, আর একটু বাঁদিকে।" অবশেষে যখন টোটোসান ছুটি শিংনির্ম্মিত কাঁটা দিয়া এই কবরীর শোভা সম্পূর্ণ করিত, তখন কাকাসানকে আজিও বেশ ভব্যযুক্ত বুড়িটি বোধ হইত, যেন জাপানী ফুল-দানিস্থিত চিত্রের ন্যায় দেখাইত।

তাহারা নিয়মিতরূপে স্নানাদিও করিত—জাপানীরা অতিশয় পরিচ্ছন্ন।

এত বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয় যে স্নানকার্য্য বারম্বার করিয়া আসিতেছে তাহা যখন পুনর্ব্বার সমাপন হইত, মৃত্যুর আসন্নতায় যে বেশবিন্যাসক্রিয়া দিন দিন অধিকতর নিষ্ফল হইতেছে তাহা যখন সমাধা হইত, তখন সেই নির্ম্মল শীতল জলে কি তাহাদের কিছুমাত্র সতেজ বোধ হইত, বিমল প্রভাতে কি তাহারা এখনো কিয়ৎ পরিমাণে জীবনের সুখ অনুভব করিত? কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! প্রতিদিন প্রাতে দুইজনে উঠিয়া আপনাদিগকে নির্জ্জীব-তর রুগ্নতর ক্ষীণতর অনুভব করা, তাহা সত্বেও প্রাণপণে জীবন-ধারণের প্রয়াস, রৌদ্রে আপনার জরাজীর্ণতা বিস্তার, চিরদিন সেই টানাগাড়িতে ভ্রমণ! সেই ধীরগতি, সেই ঘড়ঘড় শব্দ, সেই ঝাঁকানি, সেই শ্রান্তি; চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ানো—পথে পথে, মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, উৎসবের দিনে সুদূর-পল্লিস্থিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দেবালয়ে।

একদিন সকালে, মাঠের মাঝে, ছুটি রাজপথের সন্ধিস্থলে, মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আসিয়া বৃদ্ধা কাকাসানকে আক্রমণ করিল।

সুন্দর বসন্তপ্রভাত, সূর্য্যকিরণপ্লাবিত, পত্রপুষ্পশোভিত।

এই কিউ-সিউ দ্বীপে বসন্তকাল য়ুরোপীয় বসন্ত অপেক্ষা গরম এবং অচিরাগত। ইহারই মধ্যে এই উর্ব্বরা ভূমি সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজপথদ্বয়ের চতুর্দ্দিকস্থ কোমল ধান্যক্ষেত্র মৃদু সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া সবুজ মখমলসম ছায়ালোকে শোভিত। ঝিল্লির গানে আকাশ পূর্ণ। জাপানে এই পতঙ্গের স্বর অতি তীব্র।

এই চৌমাথায় কতকগুলি স্বতন্ত্র উন্নত সিডার-বৃক্ষতলে, ঘাসের মধ্যে দশবারোটি সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে; কতকগুলি কেবলমাত্র চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড, কতকগুলি বুদ্ধদেবের পদ্মাসীন প্রস্তরমূর্ত্তি। ধান্যক্ষেত্রের পরপারে বন দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা য়ুরোপীয় ওক্‌বনের ন্যায়—কিন্তু ইতস্ততঃ যে শাদা বা গোলাপী পুষ্পগুচ্ছ রহিয়াছে সেগুলি ফুটন্ত কামেলিয়া, এবং ঐ অতি সুকুমার পল্লবগুলি বাঁশবৃক্ষের; আরও দূরে ক্ষুদ্র গম্বুজ বা মিনার-আকার পর্ব্বত নীলাকাশের অঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক কিন্তু অতি সুশ্রী গঠন চিত্রিত করিয়াছে।

এই শান্তিময় শ্যামল স্থানে কাকাসানের গাড়ি থামিয়াছিল, এবং ইহাই তাহার শেষ বিশ্রাম। কতিপয় কৃষক ও কৃষকপত্নী, পরিধানে ঘননীল লম্বা সুতার পাগোডাকৃতি আস্তিনযুক্ত পোষাক, প্রায় বিশজন ক্ষুদ্রকায় দয়াশীল নিপনী সেই টানাগাড়িটির চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে বৃদ্ধা মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীরভাবে জীর্ণ হস্ত চালনা করিতেছে। টোটোসান তাহাকে তীর্থদর্শনার্থে কানন দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে সহসা এই বিপদ উপস্থিত হইল।

যাহারা কৌতূহল এবং দয়াপরবশ হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে যত্নবান হইল। তাহার

মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই কানন দেবীর—স্নেহকরুণার অধিষ্ঠাত্রীর—উৎসব দেখিতে যাইতেছিল।

বেচারি কাকাসান! তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আশায় একপ্রকার ধান্যের আরক খাওয়ানো হইল, সুগন্ধ পত্রদ্বারা তাহার গাত্রমর্দ্দন করা হইল, নদীর শীতল জল তাহার স্কন্ধদেশে সিঞ্চন করা হইল।

টোটোসান তাহাকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। সে কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার অন্ধ হস্তচালনে অন্যদের কার্য্যের ব্যাঘাত করিল, শোকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা সঘনে কাঁপিতে লাগিল।

শেষ চেষ্টাস্বরূপে, বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা লিখিত অব্যর্থ মন্ত্রপূর্ণ কাগজখণ্ডের গুলি পাকাইয়া কাকাসানকে খাওয়ান হইল। একটি হিতৈষিণী রমণী তাহার আপন আস্তিনমধ্য হইতে এই কাগজ বাহির করিয়া দিল।

বৃথা চেষ্টা, কাকাসানের পরমায়ু শেষ হইয়াছিল; মৃত্যু সেখানে অদৃশ্যরূপে অবস্থিতি করিয়া এই সকল নিপনীদিগকে উপহাসপূর্ব্বক তাহার সুদৃঢ় করকবলে বৃদ্ধাকে নিপীড়ন করিতেছিল।

আর একটি অন্তিম দারুণ অঙ্গআক্ষেপ—তাহার পর কাকাসান এলাইয়া পড়িল, তাহার মুখ খোলা, তাহার অর্দ্ধশরীর বাক্সের বাহিরে একপার্শ্বে হেলানো, তাহার হস্তদ্বয় লম্বমান, যেন পুতুলনাচ সমাপনান্তে একটি পুতুল বিশ্রাম করিতেছে।

যে ক্ষুদ্র ছায়াস্নিগ্ধ সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখে এই শেষ দৃশ্য সমাপ্ত হইল, তাহা বোধ হইল যেন দেবতা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, এবং মৃত্যুদ্বারা অনুমোদিত।

কেহ আর ইতস্ততঃ করিল না। রাস্তার কুলি ডাকাইয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে খনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তীর্থদর্শনে বঞ্চিত হইতেও তাহারা অনিচ্ছুক, অথচ এই বৃদ্ধা বেচারীকে সমাধিবিহীন রাখিয়া যাইতেও নারাজ, বিশেষতঃ যখন দিনটা গরম হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং মক্ষিকাগণ ইহারই মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে কবর প্রস্তুত হইল। মৃতদেহের স্কন্ধ ধরিয়া তাহাকে বাক্স হইতে তুলিয়া, যে ভাবে চিরকাল বসিয়া থাকিত সেইরূপ ভূমে বসানো হইল। অরণ্যবৃক্ষতলে শিকারীগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিশুষ্ক বানর দেখিতে পায়, ইহাও সেইরূপ।

টোটোসান সব কার্য্য আপনি করিতে চেষ্টা করিল, তাহার মাথার ঠিক ছিল না; কঠিনহৃদয় কুলিগণ বাধা পাইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল; সে শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরব তুলিল এবং তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে হাতড়াইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল যে, নিদেনপক্ষে কাকাসানের চুলের অবস্থা অনন্তধামে উপস্থিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট পরিপাটি আছে কি না, তাহার কেশগুচ্ছ যথাক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে কি না, এবং তাহার উপর মাটি নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে বড় বড় কাঁটাগুলি তাহার কবরীতে বসাইয়া দিতে চাহিল।

বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হইল; কাকাসানের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মা তাহার প্রেতরাজ্য আগমনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে।

সেই আবর্জ্জনাপূর্ণ বাক্স দেখিয়া কুলিগণের ঘৃণা হইল, তাহারা এ সকল জঞ্জালও কবরমধ্যে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিল; সেই গাত্রবস্ত্র, পরিধানের জীর্ণচীর এবং ছোট ছোট পেয়ালা ও লণ্ঠন, এমন কি বাক্সখানা সমেত,—তাহারা বলিল উহাতে মৃত্যুর বীজ আছে।

তখন টোটোসান, তাহার এই সকল স্মৃতিচিহ্ন লোপ পাইবে দেখিয়া দুঃখে নৈরাশ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল; রোদন করিতে করিতে একান্ত অবসন্নভাবে সে তাহাদের নিষেধ করিবার নিমিত্ত বাক্সের উপর শয়ন করিল।

কিন্তু আর একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উৎসবক্ষেত্রে যাইতেছিল। টোটোসানের উপর তাহার দয়া হইল, সে বলিল "আমি নদীর জলে এই সমস্তই ধুইয়া দিব।"

যে সকল লোক জড় হইয়াছিল তাহারা এই দুই ভিখারীকে সেই ঝিল্লিরবধ্বনিত শ্যামল নিরালায় একত্রে রাখিয়া পুনর্ব্বার দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিল।

নির্ম্মল স্রোতের জলে ভিখারিণী বাক্সসমেত সকল দ্রব্য সযত্নে ধৌত করিল। তাহার পর চীরগুলি বৃক্ষশাখার উপরে উজ্জল রৌদ্রে বিছাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সব উত্তমরূপে শুখানো গুছানো ও ভাঁজ করা হইল, এখন টোটোসান আবার তাহার ভ্রমণে বাহির হইতে সমর্থ।

সে আপনাকে বাক্সে যুতিয়া আবার চলিল, একটা কিছু টানিয়া লইয়া বেড়ানো তাহার এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পশ্চাতে, ক্ষুদ্র গাড়িটি শূন্য। যে তাহার বন্ধু, তাহার মন্ত্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার চক্ষুস্বরূপ ছিল, তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া টোটোসান দিক্‌ভ্রষ্ট ভাবে ভ্রমিতে লাগিল। সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীন কৃপাপাত্র, তাহার আয়ুঃশেষ

পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে নিতান্তই একেলা; প্রগাঢ়তর অন্ধকারে, বিক্ষিপ্তচিত্তে তাহার আশাহীন লক্ষ্যহীন পথে চলিয়াছে।

তারার আলোতে চৌদিকের শ্যামলতা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল, এবং তাহার মধ্য হইতে ঝিঁঝি পোকা মুক্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিল। অন্ধকে ঘিরিয়া যখন প্রকৃত অন্ধকার নামিতে লাগিল, তখন প্রভাতে গোর দিবার সময় বৃক্ষপত্র মধ্য হইতে যেরূপ মর্ম্মরধ্বনি নিঃসৃত হইয়াছিল আবার তাহা শ্রুত হইল। ইহা সেই প্রেতাত্মাদের মৃদুস্বর। তাহারা বলিতেছে "শান্ত হও, টোটোসান, সে এখন আমাদের ন্যায় মধুর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, তুমিও শীঘ্র সে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; সে বৃদ্ধও নহে রুগ্নও নহে, কারণ সে মৃত; দেখিতেও কুশ্রী নহে, কারণ সে ধরণীগর্ভের বৃক্ষমূল মধ্যে সুপ্রচ্ছন্ন; কাহারো ঘৃণার পাত্রীও নহে, কারণ এখন সে ভূমির সারজনক পদার্থের অন্তর্ভূত। মৃত্তিকায় সংশোধিত হইয়া তাহার দেহ পবিত্র হইবে; কাকাসান কামেলিয়া, সিডারশাখা, বাঁশঝাড়, প্রভৃতি সুন্দর জাপানী বৃক্ষে পরিণত হইবে ... .।"

মানবপ্রকাশ।

তুমি লিখ্‌চ যে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে' তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত না। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তুমি বল্‌তে চাও যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ।

এর থেকে বেশ দেখা যাচ্চে তোমাতে আমাতে কেবল ভাষা নিয়ে তর্ক চল্‌চে। আমি যাকে মূলতত্ত্ব বল্‌চি তুমি সেটা ঠিক গ্রহণ কর নি—এবং অবশেষে সে জন্য আমাকেই হয় ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদিও মূলতত্ত্ব শব্দটাকে বারম্বার ব্যাখ্যা করতে আমি ত্রুটি করিনি। এবারকার চিঠিতে ঐ কথাটা পরিষ্কার করা যাক্।

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যে-রকম ভাবে দেখ্‌ত, আমরা ঠিক সে ভাবে দেখিনে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে, যাতে করে' সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর, ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বসম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই, বৈদিক কালের ঋষি যে ভাবে উষাকে দেখ্‌তেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

প্রাচীনকাল এবং বর্ত্তমানকালে প্রধান প্রভেদ হচ্চে এই যে, প্রাচীনকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল—গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে তার সমস্ত পাপ্‌ড়িগুলি যেমন আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্রবিন্দুতে আপনাকে উন্মুখ করে' রেখে দেয় তেমনি। তখন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় নি। তখনকার অখণ্ড জীবনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সূর্য্যকিরণের মত শুভ্র নিরঞ্জনভাবে ব্যক্ত হত। এখনকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। তার সাত রং
ফেটে বা'র [illegible] কাসিসিস্ম এবং [illegible]

সেই জন্য প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসিক্ শুভ্র এবং রোমাণ্টিক্ পাঁচ্‌রঙা।

কিন্তু প্রাচীন পিতামহদের অবিশ্লিষ্ট মনে সংসারের সাত রং কেন্দ্রীভূত হয়ে যে এক একটি সুসংহত শুভ্র মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পেত তার একটা কারণ ছিল। তখন সন্দেহ প্রবল ছিল না।

সন্দেহের প্রথম কাজ হচ্চে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। আদিমকালে বিশ্বাসের কনিষ্ঠ ভাই সন্দেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—সেই জন্যে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ হয়ে যায় নি। কিম্বা সন্দেহ তখন এমনি নাবালক অবস্থায় ছিল যে, সংসারের প্রত্যেক জিনিষের উপর নিজের দাবী উত্থাপন করবার মত তার বয়স ও বুদ্ধি হয় নি। বিশ্বাসের তখন একাধিপত্য ছিল। তার ফল ছিল এই যে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্য্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে' মনে করতে পারতুম না। এমন কি, যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশ মাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা এই মনুষ্যত্ব আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে' থাকি, কিন্তু তখন এটা অলঙ্কারের স্বরূপ ছিল না। বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে তখন সমস্তই জীবন্ত হয়ে জেগে উঠ্‌ত। বিশ্বাস কোনরকম খণ্ডতা সহ্য করতে পারে না। সে আপনার সৃজনশক্তির দ্বারা সমস্ত বিচ্ছেদ বিরোধ পূর্ণ করে', সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন করে' ঐক্য নির্ম্মাণের জন্যে ব্যস্ত।

পর্ব্বোক্ত কারণেই [illegible] সাহিত্যে বেশি

মাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল। অর্থাৎ মানুষ তখন আপনাকেই সর্ব্বত্র সৃজন করে' বস্‌ত। তখন মানুষ আপনারই সুখ দুঃখ বিরাগ অনুরাগ বিস্ময় আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে' তুলেছিল। আমি বরাবর বলে' আস্‌ছি, মানুষের এই আত্ম-সৃজন পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিষ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে। এই জন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্চে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধি-কার হারিয়ে চলে' আস্‌চে। নিজের যেসকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে' দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে' আস্‌চে। পূর্ব্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল—দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত এখন তা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্চে।

যাই হোক্, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে। বরঞ্চ প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আমার কথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু "তত্ত্ব" শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুস্কিলে পড়েচি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে' কাজ করচে, তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না। যেটা আমা-দের গোচর হয়েচে তাকেই তত্ত্ব বলা যেতে পারে। সেই মানসিক পদার্থকে কেউ বা আংশিক ভাবে জানে, কেউ বা জানে না অথচ তার নির্দ্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে' যায়।

সে জিনিষটা ভারি একটা মিশ্রিত জিনিষ—তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাটবাঁধা নয়। সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূল দেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব্ব ঐক্য লাভ করেছে—সাহিত্য সেই অতি দুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ, সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয় কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্য্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনি তার নিত্যতা দেখ্‌তে পান তখনি তাকে নিয়ম নাম দেন।

আমি যে মিলনের কথা বল্লুম সেটা যত মিলিতভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনি তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। তখনি বুঝ্‌তে পারি আমার সংস্কার এক জিনিষ, বাস্তবিক সত্য আর এক জিনিষ, আবার আমার কল্পনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তখন আমাদের একান্নবর্ত্তী মানসপরিবারকে পৃথক করে' দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।

কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে' মানুষ হয়েছিল, পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দসঙ্গমের ভাষা। পূর্ব্বের মত সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই, কেন-না এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি, তার পরে একসময়ে

সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করি। পূর্ব্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েচে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এই জন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এখনই সাহিত্যের বড় বেশি আবশ্যক এবং তার আদরও বেশি।

এখন এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে যতটা দূর যাওয়া যায় তার বেশি অগ্রসর হতে পারিনে। চুট্‌কি হাসি এবং খুচ্‌রো কথার মধ্যে আপনাকে আবৃত করে' রাখি। মানুষ সাম্‌নে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এম্‌নি সহজে স্বভাবতই আত্মসম্বৃত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে, কিম্বা একটা অতি প্রবল আবেগের দ্বারা সর্ব্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রকৃত আভাস নিজে পাইনে। শেক্স্‌পিয়রের সময়েও এরকম সব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্ভব হতে পারত, এবং বিদ্যুৎ-আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া এক পলকে দৃষ্টিগোচর হত; এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আস্‌চে, এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আট্‌কা পড়ে' পোষমানা ভালুকের মত নিজের নখদন্ত গোপন করে' সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে; যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ঐ বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলচে না!

সাহিত্যের মধ্যে শেক্স্‌পিয়রের নাটকে, জর্জ্‌ এলিয়টের

নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়ভাঙ্গা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এই জন্যে শেক্সপিয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, "জোলা" অশ্লীল—কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

আর একটু খোলসা করে' বলা আবশ্যক।—

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না—সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে' মান্‌তে আমাদের আপত্তি নেই। ভালবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি; এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেন না এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে;—এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভাল এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা করে' সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মানবে? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য? সেটা কি আমাদের অনেকানেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণব্যাপী নয়? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি—এই

জন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু কোন "জোলা" যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ৎ দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেম্‌নি; তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস; তারা দুর্ব্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে' নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখন কোথাও কোন স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি—সমাজে তাদের চরম এভোল্যুশন্ হচ্চে, কেবল ফরাসী রান্না এবং ফরাসী নভেল।

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে "জোলা"র নভেলে কোন দোষ দেখ্‌তুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোন অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ডজিনিষকে খণ্ডভাবেই দেখায়। আর, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোন একটা অংশের অবতারণা করে তখন্ তাকে একটা বৃহতের একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায়, এই জন্যে আমাদের মানসগ্রামের বড় বড় মোড়লগুলিকেই সে নির্ব্বাচন করে' নেয়।

কথাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঠিক সমরেখায় পড়্‌ল কি না জানিনে। কিন্তু আমি যেটা বল্‌তে চাচ্চি সেটা এর দ্বারা কতকটা পরিস্ফুট হবে বলেই এর অবতারণা করা গেছে।

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।

শেক্সপিয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক একটা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে'

গুপ্তমানুষকে দেখ্‌তে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাসক্রমে সে লুকিয়ে পড়ে। এই জন্তে আজকালকার লেখায় প্রায় লেখকের বিশেষত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখা দেয়। কিম্বা খণ্ড খণ্ড আভাসকে কল্পনাশক্তির দ্বারা জুড়ে' এক করে' গড়ে' তুল্‌তে হয়। অন্তররাজ্যও বড় জটিল হয়ে পড়েছে, পথও বড় গোপন। যাকে ইংরাজিতে ইন্‌স্পাইরেশন্‌ বলে সে একটা মুগ্ধ অবস্থা; তখন লেখক একটা অর্দ্ধচেতন শক্তির প্রভাবে কৃত্রিম জগতের শাসন অনেকটা অতিক্রম করে এবং মনুষ্যরাজার যেখানে খাষ দরবার সেই মর্ম্মসিংহাসনের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক্‌, আর অন্যের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হোক্‌, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক্‌ আর মনুষ্য-চরিত্র গঠিত করেই হোক্‌ মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ্য।

প্রকৃতিবর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোন মাথাব্যথাই নেই—কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন কি, ভাষা তা ছাড়া আর কিছু পারে না। চিত্রকর যে রং দিয়ে ছবি অাঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয় নি—কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের হৃদয়ের দোলায় লালিত-পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত করে' নিছক্‌ বর্ণনা-টুকু করে' গেলে যে কাব্য হয় একথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্য্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্য্যের ছবি নয়, মানবের ছবি—ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কি গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিষ যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে যতই সচেতন হব, প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই ত কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সে ত বর্ণনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিষ, প্রকৃতির জিনিষ নয়। অতএব, এমন কোন বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম্ম নেই কিম্বা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকটসম্পর্কে বদ্ধ নয়।

আমার বোধ হচ্চে আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম, যে, সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এইরকম বুঝিয়ে গেছে। আমার সেই সামান্য আদিম অপরাধ তুমি কিছুতেই মার্জ্জনা করতে পারচ না; তার পরে আমি যে কথাই বলি না কেন তোমার মন থেকে সেটা আর যাচ্চে না। আদম যেমন প্রথম পাপে তাঁর সমস্ত মানববংশসমেত স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন তেম্‌নি আমার সেই প্রথম ত্রুটি ধরে' আমার সমস্ত সংস্কার ও যুক্তি-পরম্পরাসুদ্ধ আমাকে মতচ্যুত করবার চেষ্টায় আছ।

আমার বলা উচিত ছিল লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকা-

শই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)। কখন নিজত্ব দ্বারা, কখন পরত্ব দ্বারা। কখন স্বনামে কখন বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। আমার গোড়াকার চিঠিতে যদি এ কথা প্রকাশ হয়ে না থাকে তা হলে জেনো সেটা আমার অনিপুণতাবশতঃ। একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মত লোক তার ব্যাখ্যাকারক। কথা আছে, একে বোবা তাতে আবার বোলতায় কাম্‌ড়েছে—একে গোঁ গাঁ করা বই আর কিছু জানে না তার উপরে কামড়ের জালায় গোঁগাঁনি কেবল বাড়িয়ে তোলে।

আমি যে এই আলোচনা করচি এ যেন মানসিক মৃগয়া করচি। একটা জীবন্ত জিনিষের পশ্চাতে ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্চি—পদে পদে স্থানপরিবর্ত্তন করচি, কখনো পর্ব্বতের শিখরে কখনো পর্ব্বতের গুহায়। এই জন্য আমার সমস্ত আলোচনায় যদিও লক্ষ্যের ঐক্য আছে কিন্তু হয় ত পথের অনৈক্য পাবে। কিন্তু সে সমস্ত মার্জ্জনা করে' তুমিও যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, যদি আমার পাশাপাশি ছোট, তা হলে আমার মৃগটি যদি বা সম্পূর্ণ ধরা না পড়ে নিদেন তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তোমাকে বোঝাতে ভুল করে' থাকি তুমি নিজে ঠিকটা বোঝ। অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে মাছটা ধরে' দিতে না পারি, আমার পুকুরটা ছেড়ে দিচ্চি, তুমিও জাল ফেল! কিন্তু, কিছু উঠ্‌বে কি? সে কথা বল্‌তে পারিনে—সে তোমার অদৃষ্ট, কিম্বা আমার অদৃষ্ট, যাই বল!

কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। তুমি